ইসলাম পালনের মূলনীতি

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়।
(সূরা তাহরীম, আঃ ০৬)

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

ইসলাম পালনের মূলনীতি

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর

ইসলাম পালনের মূলনীতি

লেখকঃ হাবীবুল্লাহ মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর

সম্পাদকঃ জিহাদুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ঈসায়ী
২৪ই রজব, ১৪৪৪ হিজরি
দ্বিতীয় প্রকাশঃ জানুয়ারী, ২০২৪ ঈসায়ী
তৃতীয় প্রকাশঃ মার্চ, ২০২৫ ঈসায়ী

প্রকাশনায়ঃ অন্তিম প্রকাশনী
কম্পিউটার কম্পোজঃ এম এম রহমান

হাদিয়াঃ ১৪০ (একশত চল্লিশ) টাকা মাত্র।

অন্যান্য বইসমূহঃ http://cutt.ly/akhirujjamanbooks
যোগাযোগঃ backup.2024@hotmail.com
বই কিনুনঃ http://cutt.ly/ontim_prokashoni

ISLAM PALONER MULNITI WRITTEN BY HABIBULLAH MAHMUD BIN ABDUL QADIR, EDITED BY JIHADUL ISLAM. PUBLISHED BY ONTIM PROKASHONI. COPYRIGHT: PUBLISHER. 1st PUBLISHED ON: 15th FEBRUARY, 2023 ISAYI, RAJAB 24th, 1444 AH HIJRI.

লেখক পরিচিতি

নাম মাহমুদ। ডাকনাম জুয়েল মাহমুদ, তাঁর স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের মানুষই তাকে "হাবীবুল্লাহ মাহমুদ" নামে চিনে। পিতা আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন এবং জননী সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

জন্ম: তিনি ১৪১৬ হিজরীর জুমাদিউল আওয়াল মাসের ৬ তারিখ (ঈসায়ী ১৯৯৫ সালের ১লা অক্টোবর) রবিবার সকালে নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার পাঁকা ইউনিয়নের অন্তর্গত উত্তর গাঁওপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা-মাতার দিক থেকে কয়েক জন উর্ধ্বতন পুরুষের নামঃ

■ পিতার দিক হতে- আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন বিন আব্দুল গফুর বিন খাবীর বিন আব্দুল বাকী বিন মাওলানা নজির উদ্দিন আল-যোবায়েরী (রহঃ) বিন মোল্লা আব্দুছ ছাত্তার মুর্শিদাবাদী বিন শাইখ আবদে হাকিম ইউসুফী (রহিঃ)। যিনি ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাদের নিয়ে 'বদরী কাফেলা' নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে লড়াই করেন। অতঃপর ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্চের ৩ তারিখে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন এবং কলিকাতায় ইংরেজদের কারাগারে বন্দী থাকেন। পরিশেষে তিনি ইংরেজদের নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই বাদ আসর কারাগারে ইন্তেকাল করেন।[১]

■ মাতার দিক হতে- সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন বিন ইব্রাহীম বিন কাসেম মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বিন বাহলুল বিন নূর উদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

শিক্ষা জীবন: তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। অতঃপর তাঁর নানার সহযোগিতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে তিনি কিছু অংশ মুখস্থও করেন। অতঃপর বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

---

১. ভারতবর্ষের মুসলিমদের ইতিহাস (মুসলিম শাসন), লেখক: আব্দুল করিম মোতেম, পৃষ্ঠা ৩০৬।

সূচিপত্র

সূচিপত্র

✍ ভূমিকাঃ

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আ-লামীন, ওয়াল 'আ-ক্বিবাতুলিল মুত্তাক্বীন। ওয়াছছলাতু ওয়াস সালামু আ'লা রসূলিহী মুহাম্মাদিও ওয়া 'আলা আ-লিহী ওয়া আছহা-বিহী আজমাঈন,

ওয়া কলাল্লহু তা'য়ালা- ইয়া আইয়ূ হাল-লাজিনা আ'মানূ কু আংফুছাকুম ওয়া আহলিকুম না-র ওয়া কুদুহান না'সু ওয়াল হিজা'রতু আলাইহা মালা'ইকাতুন গিলাজুং শিদা-দুল লা-ইয়াআ' ছূনা ল্ল-হা মা-আমারোহুম ওয়া ইয়াফ 'আলূনা মা-ইউ'মারু-ন। ওয়া বাআ'দু।

সম্মানিত পাঠক বন্ধু,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ।

আমি মনস্থ করেছিলাম যে, 'মূলত জনকল্যাণকর কাজের উদ্দেশ্যেই ইসলামের আগমন" বইটি লেখা শেষ করেই বই লেখা থেকে কিছুদিনের জন্য বিরতি নেব। কিন্তু তা আর হলো না, বড় ধরনের কোন না কোন বিষয় আবারো সামনে এসে দাড়ালো।

আর সে জন্যেই আরোও একটি বই লেখার জন্য মনস্থ করলাম। তাই বেশি সময় নষ্ট না করেই আবার লিখতে বসলাম। এবারের এই বইটির নাম দিয়েছি- "ইসলাম পালনের মূলনীতি"। তবে এই নামটি দেওয়ার পেছনেও কিছু কারণ রয়েছে। আর সেই কারণ হলো আমার খুব কাছের কিছু লোকদের পূণাঙ্গ ইসলাম পালনে অবহেলা আর সেই অবহেলাই আমার অন্তরকে পীড়িত করেছে। এর পেছনে কারণ হল আমার কাছের যেই লোকগুলো পূণাঙ্গ ইসলাম পালনে অবহেলা করেছেন। তারাও কোন না, কোন ভাবে দ্বীনের দ্বা'য়ী এবং ইসলামের দাওয়াতী কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। তাদের এই অবহেলায় আমার সমস্যা হলো- "যদি ব্যক্তির নিজের ভেতরে ইসলামের আমল না থাকে, তবে সে অন্য মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে দাওয়াতের সুন্দর মাঠটি নষ্ট করা ছাড়া তার আর কিছুই করার থাকবে না"। আর এই কাজটিকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঘৃণা করেন।

ইসলাম পালনের মূলনীতি

আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿﴾

অর্থ: “হে মু’মিনগণ; তোমরা যাহা কর না তাহা তোমরা কেন বল? তোমরা যাহা কর না, তোমাদের তাহা বলা আল্লাহর কাছে অসন্তোষজনক।” (সূরাহ সফ, আ: ২-৩)

সে জন্যই আগে জরুরত হলো একজন দ্বায়ী মানুষকে যখন ইসলামের জন্য দাওয়াত করবে, তার পূর্বে অবশ্যই তার নিজের সাড়ে তিন হাত বডিতে ইসলাম পালনের চেষ্টা করবে।

যেমন: দ্বায়ী এর শরীরে সুন্নাতের নিদর্শন থাকা উত্তম।

মুসলিম ব্যক্তি দ্বায়ী হোক, চায় দ্বায়ী না হোক। তাকে সকল সময়ই প্রকৃতিগত সুন্নাত সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে এবং তা নিজের শরীরেই বাস্তবায়ন তথা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যদিও মুসলিম মানেই সে একজন দ্বা’য়ী, তাকে সকল সময়ই ইসলামের দাওয়াতি কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে।

পাঠক বন্ধু! যদিও আমি আমার কাছের সেই কিছু সংখ্যক ব্যক্তিদেরকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করেছি এবং তা পালনের জোর তাকিদ দিয়েছি। তবুও আমি মুসলিম জনসাধারণের নিকট আরো সহজ ভাবে ইসলামের কিছু বিষয় সংক্ষেপে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। আশা করি বইটি পঠনের মাধ্যমে পাঠকগণ, পরকালীন পাথেয় সংগ্রহে যত্নবান হবেন এবং ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ লাভ করবেন। মহান আল্লাহ তা’য়ালা আমাদের সকলকেই এই বইটি পড়ে তদানুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করুন ‘আমীন’। পরিশেষে বইটি লিখতে গিয়ে শব্দ বা বানানে ভুল হওয়া অস্বাভাবিক কিছু না। যদি পঠনের সময় পাঠকের দৃষ্টিতে কোন ভুল চোখে পড়ে তবে তা সংশোধনের জন্য অবগত করবেন।

নিবেদক
লেখক
তাং ২০/০৫/২০২২ ঈসায়ী

✍ ইসলামের সংজ্ঞা:

প্রিয় পাঠক! ইসলাম পালনের মূলনীতি আলোচনার পূর্বেই আমি ইসলামের সংজ্ঞা উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি। ইসলাম হল তাওহীদ সহকারে মহান আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পন করা, পরিপূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে এবং শিরক ও শিরককারীদের থেকে বিমুখ হয়ে মহান আল্লাহর প্রতি একান্ত অনুগত হয়ে যাওয়া। (ঈমানের তিন মূলনীতি -ড. মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন,পৃ: ৬৪; আল-উসূলূছ ছালাছাহ -শাইখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব, পৃ: ০২)

ড. মোহাম্মাদ ইমাম হোসাইন সাহেব বলেন, মহান আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পন দুই ধরনের হয়ে থাকে।

১. বাধ্য হয়ে মহান আল্লাহর প্রতি অনুগত হওয়া, এটি ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

অর্থ: "তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করছে অথচ আসমান সমূহ ও জমিনে যা আছে তা তারই আনুগত্য করে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এবং তাদেরকে তারই নিকট প্রত্যাবর্তন করা হবে।" (সূরাহ আলে-ইমরান, আ: ৮৩) এ ধরনের আনুগত্যকে ইসলাম বলে না।

২. ইবাদাত সমূহকে একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে তাওহীদ সহকারে মহান আল্লাহর আনুগত্য হওয়া। এটিকেই ইসলাম বলা হয়।
পাঠক বন্ধু! মহান আল্লাহ তা'য়ালার মনোনীত যে দ্বীন সেটিই এই ইসলাম। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

অর্থ: “আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম।” (প্রথমাংশ) (সূরাহ আলে ইমরান, আ: ১৯)

আর মহান আল্লাহ তা’য়ালার নিকট তাওহীদ সহকারে আত্মসমর্পন করার মাধ্যম দুটি;

১. আল্লাহ তা’য়ালার আদেশ সমূহ মানতে হবে এবং নিষেধ সমূহ থেকে বিরত থাকতে হবে।

২. শিরক এবং শিরককারীদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۴﴾

অর্থ: “তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত করো তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শুরু হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যদি না তোমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান আনো।” (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ০৪)

✍ ইসলাম পালনের মূলনীতিঃ

প্রিয় পাঠক!

ইসলাম পালনের মূলনীতি সাধারণত দুটি-

(ক) জাহান্নামের আগুন থেকে “নিজে বাঁচা”।

(খ) এবং “পরিবার-পরিজনকে বাঁচানো”।

মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

অর্থঃ “হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে বাচাও, জাহান্নামের আগুন থেকে!” (সূরাহ তাহরীম, আঃ ৬)

অতএব, যদি কোন ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ইসলাম পালন করতে চায়, তবে অবশ্যই তাকে এই দুটি মূলনীতি অনুযায়ীই ইসলাম পালন করতে হবে। আর এই দুইটি মূলনীতির প্রথমটিই হল জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে বাচানো।

নিম্নে প্রথম দফা মূলনীতির আলোচনা করা হলোঃ

✍ (ক) নিজেদেরকে বাঁচানোঃ

পাঠক বন্ধু! মহান আল্লাহ তা’য়ালা ইসলাম পালনের মূলনীতি দুটি উল্লেখের পূর্বেই একটি শর্ত দিয়েছে, আর তা হলো মুমিন তথা ঈমানদার হতে হবে। কেননা ঈমান আনয়ন না করে, কোন ক্রমেই জাহান্নামের আগুন থেকে বাচা যাবে না। কারণ, যারা ঈমান আনায়ন করে না, তাদেরকে ইসলাম ‘কাফের’ বলে আখ্যায়িত করেছে।

ইসলাম পালনের মূলনীতি

মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿۶﴾

অর্থ: “কিতাব প্রাপ্তদের মধ্যে যাহারা কুফরী করে তাহারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; উহারাই সৃষ্টির অধম।” (সূরাহ বায়্যিনাহ, আ: ৬)

ঈমান শব্দের শাব্দিক অর্থ বিশ্বাস করা, সত্যায়ন করা প্রভৃতি। ইসলামী পরিভাষায়- অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কাজ করাকেই ঈমান বলা হয়। আর এই ঈমানের রুকন হলো- ৬টি। হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন “ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ, তার ফেরেশতাকুল, তার কিতাবসমূহ, তার প্রেরিত নবীগণ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখবে এবং তুমি তাকদিরের ভালো ও মন্দের প্রতি ও ঈমান রাখবে।” (ছহীহ মুসলিম, হা: ৮) অতএব, এই বিষয়গুলোর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে এবং তদানুযায়ী আমল করতে হবে। তবেই তাকে একজন মুমিন হিসেবে গণ্য করা হবে।

কাজেই যারা উল্লেখিত বিষয় সমূহের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করেছে, মহান আল্লাহ তা’য়ালা কেবল মাত্র তাদেরকেই ডাক দিয়ে বলেছেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿۶﴾

অর্থ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে বাচাও, জাহান্নামের আগুন হতে।” (সূরাহ তাহরীম, আ: ৬)

যারা ঈমানদার নয়; তাদের জন্য মহান আল্লাহ তা’য়ালার এই আহ্বান নয়।

সুতরাং আমরা যারা ঈমান এনেছি এবং ঈমানদারের দাবি করি, অবশ্যই আমাদেরকে আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিতে হবে। আর সেই জাহান্নামের আগুন

থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ, তা হল ইসলাম। আর আমি ইসলাম সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করেছি, এখন শুধু জানাবো আমরা কিভাবে ইসলাম পালন

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে পবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরাহ বাকারাহ, আ: ২০৮)

অতএব, ইসলাম পালন করতে হলে ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে হবে। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহি:) বলেন, (সিন, লাম, মিম) শব্দটি যের ও যবর সহযোগে (ছিলম ও ছাল্‌ম) দুটি পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের মতে ইসলাম অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ইবনে কাছীর বলেন, (কাফফাতান) শব্দটি পরিপূর্ণ ভাবে এবং সাধারণ ভাবে এই দু'ই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী এখানে বাক্যটির গঠন হচ্ছে অবস্থাজ্ঞাপক। এতে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। একটি হচ্ছে (উদখুল্‌) (তোমরা অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও) শব্দে যে সর্বনাম রয়েছে, তার অবস্থা জ্ঞাপন করছে। অথবা ইসলাম অর্থে শব্দটির অবস্থা জ্ঞাপন করছে। প্রথম ক্ষেত্রে অনুবাদ দাঁড়ায় এই যে, তোমরা সম্পূর্ণ ভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ তোমাদের হাত-পা, চোখ-কান, মন-মস্তিষ্ক সব কিছুই যেন ইসলামের আওতায় এবং আল্লাহর অনুগত্যের মধ্যে এসে যায়। এমন যেন না হয় যে হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ইসলামের বিধানসমূহ পালন করে যাচ্ছ অথচ তোমাদের মন মস্তিষ্ক তাতে সন্তুষ্ট নয়। কিংবা মন-মস্তিস্ক ইসলামের অনুশাসনে সন্তুষ্ট বটে, কিন্তু হস্ত-পদাদি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ তার বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আয়াতটির অনুবাদ এই যে, তোমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ এমন যাতে না হয় যে,

ইসলামের কিছু বিষয় মেনে নিলে আর কিছু মানতে গিয়ে গড়িমসি করতে থাকলে।

তাছাড়া কুরআন ও সুন্নাতে বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম। (তাফসিরে মা'রিফুল কুরআন, পৃঃ ১০৫)

অতএব, ইসলাম পালন করতে হলে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। আপনার শরীর-মন-মস্তিষ্ক সকল কিছু দ্বারাই ইসলাম পালন করতে হবে।

আর ব্যক্তি জাবনের আমলের তথা ইসলাম পালনের প্রথম দফা মুলনীতির কিছু ব্যক্তি আমল আমি নিম্নে উল্লেখ করছি, যার প্রথমটিই হল ফিতরাত বা স্বভাবজাত সুন্নাত।

✍ ফিতরাত বা স্বভাবজাত সুন্নাতঃ

পাঠক বন্ধু! আমাদের মধ্যে এমনও মুসলমান পাওয়া যায়, যারা মুসলমানদের স্বভাবজাত সুন্নাত সম্পর্কে জানেই না। কাজেই সেটা আমাদের সকলেরই জানা প্রয়োজন। স্বভাবজাত সুন্নাত হল, এমন রীতি যা সম্পাদন করলে এর সম্পাদনকারী এমন ফিতরাতের সাথে বিশেষায়িত হবেন যে ফিতরাতের উপর আল্লাহ তার বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করে তার হাশর-নাশর হবে। আল্লাহ তাদেরকে এর জন্য ভালোবাসেন। যেন তারা এর মাধ্যমে পূর্ণ গুণের অধিকারী হতে পারে এবং আকতিগত ভাবে মর্যাদা পায়। এ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াত একমত যে, এটা একটি প্রাচীন সুন্নাত যা সকল নবী পছন্দ করেছেন। এটি স্বভাবজাত বিষয়। (ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খন্ড, প্রথম পর্ব, পৃ:১৭২; নাইলুল আওতার ১/১০৯)

আর এই স্বভাবজাত রীতি অনুসরণের মাধ্যমে দ্বীনি ও দুনিয়াবী অনেক কল্যাণ রয়েছে। যেমনঃ এর ফলে সমুদয় দৈহিক গঠন সুন্দর থাকে এবং শরীর পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্ন থাকে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খন্ড, প্রথম পর্ব, পৃ:১৭২; ইমাম মানভী (রহি) প্রণীত ফাইযুল কাদীর ১/৩৮)

এই স্বভাবজাত সুন্নাত প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিসে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন- স্বভাবজাত বিষয় ৫টি।

খাৎনা করা, নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা, (গোঁফ বা মোচ) ছোট করা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়িয়ে ফেলা। (ছহীহ বুখারী, হাঃ ৫৮৯১; মুসলিম, হাঃ ২৫৭)

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন- ১০টি বিষয় স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। (গোফ তথা মোছ) খাটো করা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেয়া, নখ কাটা, অঙ্গের গীরাসমূহ ঘষে মেজে পরিষ্কার করা, বগলের পশম উপড়িয়ে ফেলা, নাভীর নিচের পশম পরিস্কার করা, মলমূত্র ত্যাগের পর পানি ব্যবহার করা তথা ইসতিনজা করা। যাকারিয়া (রহিঃ) বলেন-মাসআব (রহিঃ) বলেছেন- আমি দশ নম্বরটি ভুলে গেছি। সম্ভবতঃ তা হলো কুলি করা। (ছহিহ মুসলিম, হা ২৬১; আবু দাউদ, হা ৫২)

আবূ মালিক কামাল বিন আস সাইয়্যিদ সালিম (রহি:) উল্লেখিত হাদিস দুটি উল্লেখের পর ১০টি স্বভাবজাত সুন্নাতের তালিকা উল্লেখ করেন, যা নিমে উল্লেখ করা হলো:

১। খাতনা করা।

২। মলমূত্র ত্যাগের পর পানি ব্যবহার করা তথা ইসতিনজা করা।

৩। গোঁফ তথা মোছ খাটো করা।

৪। দাড়ি লম্বা করা।

৫। মিসওয়াক করা।

৬। বিভিন্ন অঙ্গের গিরাসমুহ ঘষে ধৌত করা।

উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত গিরা যেগুলোতে ময়লা জমা হয়। যেমন-আঙ্গুলের গিরা সমূহ। কানের গোড়াসমূহ ইত্যাদি।

৭। নখ কাটা

৮। নাভীর নিচের পশম মুন্ডন করা।

৯। বগলের পশম উপড়িয়ে ফেলা।

১০। কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া। (ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খন্ড, প্রথম পর্ব, পৃঃ ১৭৩)

✍ খাৎনা করাঃ

খাৎনার শাব্দিক অর্থ কর্তন করা।

ইসলামী পরিভাষায়ঃ পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ আবৃতকারী চামড়া ও নারীর যৌনাঙ্গের পর্দা (ভৌগলিক কারণে সতীচ্ছেদ পর্দা বা হাইমেন মেমব্রেন অনেক মোটা হয়) কেটে দেওয়াকে খাতনা বলে। (ফিকহুস সুন্নাহ, প্রথম খন্ড, পৃঃ১৭৪; তুহফাতুল মাওদূদ, ইবনূল কাইয়্যিম (রহিঃ), ১০৬-১৩২)

ইমাম ইবনে কুদামা (রহ) বলেন, খাৎনা করা পুরুষের জন্য ওয়াজিব। আর মহিলাদের জন্য সম্মানজনক কাজ। এটা তাদের প্রতি ওয়াজিব নয়। (আল-মুগনি ১/৮৫)

✍ পুরুষের প্রতি খাতনা করা ওয়াজিবঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন- ইবাহীম খলীলুর রহমান ৮৩ বছর বয়সে তার খাতনা করেছিলেন। (ছহিহ বুখারী, হা-৬২৯৮;

মুসলিম, হা-৩৭০) মহান আল্লাহ তা'য়ালা তার রসূল মুহাম্মদ ﷺ কে লক্ষ্য করে বলেন-

﴿ ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۭ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾

অর্থ: "তারপর আমি তোমার প্রতি ওয়াহী পাঠিয়েছি যে, তুমি মিল্লাতে ইবাহিমের আনুগত্য কর, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (সূরা নাহল, আ: ১২৩)

হাদিসে বর্ণিত আছে- একদা এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি তোমার দেহ থেকে কুফরীর চিহ্ন দূর কর এবং খাৎনা কর। (আবু দাউদ, হাঃ ৩৫৬; বাইহাকী, ১/১৭২)

✍ খাৎনা করা মহিলাদের প্রতি ওয়াজিব নয়; বরং সম্মানজনক:

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহিঃ) বলেন, খাৎনার ব্যাপারে পুরুষগণ কঠোর ভাবে নির্দেশিত। কেন না তারা যদি খাৎনা না করে তাহলে লিঙ্গের অগ্রভাগে চামড়ার মধ্যে প্রস্রাবে ভিজা থেকে যায় যা ভালোভাবে ধোয়া যায় না। কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে এরকম হয় না। মূলত পুরুষদের খাৎনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, লিঙ্গের অগ্রভাগের চামড়ার ভিতরে প্রস্রাব আটকে থেকে যে অপবিত্রতা সৃষ্টি হয় তা থেকে বেচে থাকা। আর মহিলাদের খাৎনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তার উত্তেজনা বা কামভাবকে পুরুষের সমপর্যায়ে নিয়ে আসা। যাতে তারা প্রবল কামভাব সম্পন্ন না হয়। আর তাদের খাতনা হচ্ছে লজ্জাস্থানের উপরিভাগে মোরগের মুকুটের ন্যায় যে উচু চামড়া থাকে তা হালকা ভাবে কেটে বা ছোট করে দেওয়া। তবে কাটা বেশি হলে কামভাব দুর হয়ে যাবে। তখন স্বামীর উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না।

*** মহিলাদের খাতনার ব্যাপারে বর্ণিত হাদিস-**

হযরত উম্মে আত্বীয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত- জনৈক মহিলা মাদীনায় (মেয়েদের) খাৎনা করাতো। নবী ﷺ তাকে বললেন- খাৎনা স্থানের অংশ খুব বেশি কাটিও না। কেননা এটা (কম কাটার জন্য সঙ্গমের সময়) নারীর জন্য অধিক তৃপ্তিদায়ক এবং স্বামীর কাছে খুবই প্রিয়। (আবু দাউদ, হাঃ ৫২৭১)

✍ ইসতিনজা করাঃ

ইসতিনজার আভিধানিক অর্থ পরিত্রাণ পাওয়া বা কর্তন করা।

পরিভাষায়ঃ পানি, পাথর, কাগজ বা অনরুপ কিছু দ্বারা দু'রাস্তা (তথা অগ্র ও পশ্চাদ) দিয়ে নির্গত-নাপাক দূর করাকে ইসতিনজা বলে। (আল মুগনী ১/২০৫)

জমহুর আলিমদের মতে দু'রাস্তা (তথা অগ্র ও পশ্চাদ) দিয়ে স্বভাবজাত যা নির্গত হয়ঃ যেমন- পেশাব, মযি, পায়খানা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইসতিনজা করা ওয়াজিব। (ফিকহুস সুন্নাহ, প্রথম খন্ড, প্রথম পর্ব, পৃঃ ১৫৫)।

ইসতিনজা করা ওয়াজিব সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসঃ নবী ﷺ বলেছেন- তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় গমন করে, তখন সে যেন তার সাথে তিনটি পাথর (কুলুখ) নিয়ে যায়, যা দ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করবে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট। (আবু দাউদ, হাঃ ৪০; নাসাঈ, হাঃ ১/১৮)

✍ দুইটি বস্তু দ্বারা ইসতিনজা করা বৈধঃ

যথাঃ

(ক) পাথর এবং অনুরূপ জমাটবদ্ধ পদার্থঃ যেগুলো দ্বারা নাপাক দূর করা যায় ও যা ব্যবহার হারাম নয়। যেমনঃ কাগজ, নেকড়া, শুকনো কাট এবং যা দ্বারা নাপাকমুক্ত করা যায় এমন বস্তু। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ)

বলেন- আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন- তোমরা কেউ যখন ঢিলা কুলুপ ব্যবহার করবে তখন, সে যেন তিনটি ঢিলা ব্যবহার করে। (বাযলুল ইহসান ১/৩৫১)

পাঠক বন্ধু! যদি তিনটি পাথর দ্বারা নাপাক মুক্ত হয় তাহলে ভালো কথা। আর না হলে তিনটির বেশি, যতক্ষণ না নাপাকমুক্ত হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খন্ড পৃ: ১৫৭)

তবে বিশুদ্ধ মতে তিনটি পাথরের কমে ইসতিনজা করা বৈধ নয়। হযরত সালমান (রাঃ) বলেন- নিশ্চয় নবী কারীম ﷺ আমাদেরকে কিবলামুখী হয়ে প্রস্রাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন- আমরা যেন ডান হাত দিয়ে ইসতিনজা না করি, তিনটি পাথরের কমে যেন ইসতিনজা না করি এবং গোবর ও হাড্ডি দ্বারা যেন ইসতিনজা না করি। (মুসলিম, হাঃ ২৬২; নাসায়ী, হাঃ ১/১২) এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখিত যে, গোবর ও হাড্ডি দ্বারা ইসতিনজা করা বৈধ নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন- তোমরা গোবর ও হাড্ডি দিয়ে ইসতিনজা করো না। কেন না তা তোমাদের ভাই জীনদের খাবার। (মুসলিম, হাঃ ৬৮২; তিরমিযী, হাঃ ১৮)

(খ) পানি দ্বারা ইসতিনজা করা: হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন- আল্লাহর রসূল (সাঃ) পায়খানায় প্রবেশ করতেন, আর আমি ও আমার মত আরেকটি ছেলে তখন পানি পাত্র ও বর্শার ন্যায় লাঠিসহ তার পানি নিয়ে যেতাম। এই পানি দিয়ে তিনি শৌচকার্য করতেন। (ছহিহ বুখারী, হাঃ ১৫১; মুসলিম, হাঃ ২৭০,২৭১) আবূ মালিক কামাল বিন আস সাইয়্যিদ সালিম (রহিঃ) বলেন- পাথর দ্বারা ইসতিনজা করার চাইতে পানি দ্বারা ইসতিনজা করাই উত্তম। মহান আল্লাহ পানি দ্বারা ইসতিনজা করার জন্য কুবাবাসীদের প্রশংসা করেছেন।

হযরত আবু হুরায়র (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন-

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿...﴾

এ আয়াতটি কুবাবাসীদের প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়েছে; এখানে কিছু লোক রয়েছে যারা পবিত্রতাকে পছন্দ করে' (সূরাহ তাওবা, আঃ ১০৮) আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন- তারা পানি দ্বারা ইসতিনজা করে। ফলে আল্লাহ তাদের ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (আবু দাউদ হাঃ ৪৪; তিরমিযী হাঃ ৩১০০)

ইমাম তিরমিযী (রহিঃ) বলেন, এর উপরেই বিদ্বানগণ আমল করে থাকেন। তারা পানি দ্বারা ইসতিনজা করাকেই পছন্দ করেন, যদিও পাথর দ্বারা ইসতিনজা করা তাদের কাছে বৈধ। তারা পানি দ্বারা ইসতিনজা করাকে উত্তম মনে করেছেন। (ফিকহুস সুন্নাহ, প্রথম খন্ড, পৃঃ১৫৮)

✍ ইসতিনজা করার কিছু বিধিমালাঃ

১। ডানহাত দ্বারা ইসতিনজা করা যাবে না।

হযরত আবূ কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন- তোমাদের কেউ যেন প্রস্রাব করার সময় ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ না ধরে, পায়খানার পর ডানহাত দিয়ে শৌচকার্য না করে এবং পানি পান করার সময় পাত্রের মধ্যে নি:শ্বাস না ছাড়ে। (ছহিহ বুখারী হাঃ ১৫৩; মুসলিম হাঃ ২৬৭)

২। প্রস্রাবের সময় ডান হাত দ্বারা লজ্জাস্থান স্পর্শ করা যাবে না। (ছহিহ বুখারী হাঃ ১৫৩; মুসলিম হাঃ ২৬৭)

৩। ইসতিনজার পর মাটিতে হাত মাজতে হবে অথবা সাবান, ছাই এ জাতীয় কিছু দ্বারা হাত ধৌত করতে হবে; হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন পায়খানায় গমন করতেন তখন আমি, পিতল বা চামড়ার পাত্রে পানি দিয়ে যেতাম। অত:পর তিনি ইসতিনজা করে মাটিতে হাত ঘষতেন। (আবু দাউদ হাঃ ৪৫; ইবনে মাজাহ হাঃ ৬৭৮)

৪। সন্দেহ দূর করার জন্য প্রস্রাবের পর কাপড়ে ও লজ্জাস্থান বরাবর পানি ছিটিয়ে দিবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন- আল্লাহর রসূল ﷺ একবার করে অযু করতেন এবং তার লজ্জাস্থান বরাবর পানি ছিটিয়ে দিতেন। (ছহিহ্, দারিমী হা: ৭৩৮; বাইহাকী ১/১৬১)

✍ মল-মুত্র ত্যাগের বিধিঃ

১। জনসাধারণের সান্নিধ্য থেকে দূরে এবং আড়ালে যেতে হবে, বিশেষত খোলা জায়গা হলে দূরবর্তী যেতে হবে, যেন মানুষের চোখে না পড়ে। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, একদা আমরা এক সফরে রসূল ﷺ এর সাথে বের হলাম, রসূল ﷺ মলমূত্র ত্যাগের জন্য এতদূর যেতেন যে, তাকে কেউ দেখতে পেত না। (আবু দাউদ হা: ২; ইবনে মাজাহ হা: ২৩৫)

২। মানুষ চলাচলের রাস্তায় বা যে সকল গাছের ছায়ায় মানুষ বিশ্রাম নেয় অথবা অনুরূপ স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা যাবে না। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা এমন দুটি কাজ হতে বিরত থাকো যা অভিশপ্ত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন- হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সেই অভিশপ্ত কাজ দুটি কি? জবাবে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন- যে ব্যক্তি মানুষের চলাচলের পথে কিংবা ছায়াযুক্ত স্থানে (বৃক্ষের ছায়ায় যেখানে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে) প্রস্রাব পায়খানা করে। (মুসলিম হা: ২৬৯; আবু দাউদ হা: ২৫)

৩। প্রবহমান নয় এমন আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা যাবে না। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন-নিশ্চয় আল্লাহর রসূল ﷺ আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম হা: ২৮১)

৪। গোসল খানায় প্রস্রাব করা যাবে না- বিশেষত যে স্থানে পানি জমা হয়ে থাকে। কেননা- নবী ﷺ নিষেধ করেছেন, কোন ব্যাক্তি যেন গোসল খানায় প্রস্রাব না করে। (নাসায়ী ১/১৩০; আবু দাউদ হা: ২৮)

৫। আল্লাহর যিকর বা নাম লিখিত আছে এমন কোন জিনিস মলমূত্র ত্যাগকারীর সাথে নিয়ে যাবে না। যেমনঃ আংটি, অথবা আল্লাহর নাম লেখা গেঞ্জি অনুরূপ কিছু। কেননা ইসলামী শরিয়াতে আল্লাহর নামকে সম্মান করা জরুরী।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ

অর্থ: "যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই।" (সূরা হাজ্জ, আ: ৩২)

এ ব্যাপারে হাদিসে বর্ণিত আছে- হযরত আনাস (রা:) বলেন, নবী ﷺ যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন আংটি খুলে রাখতেন। (ফিকহুস সুন্নাহ, প্রথম খন্ড, পৃ: ১৬৩)

তবে কারো মোবাইল ফোনে স্ক্রিন ওয়াল পেপার এ যদি আল্লাহর নাম না থাকে তথা মোবাইল ফোনের বাটন চেপেই যদি আল্লাহর নাম বা কুরআনের আয়াত না আসে, তবে সেই মোবাইল ফোন নিয়ে পায়খানায় প্রবেশ করলে সমস্যা নেই।

৬। পায়খানায় প্রবেশের সময় 'দুয়া' পাঠ করতে হবে ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে-এটা মলমূত্র ত্যাগের ঘরে প্রবেশের সময় এবং খোলা ময়দানে কাপড় তোলার সময় বলতে হবে।
হযরত আনাস (রা:) বলেন, নবী ﷺ যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন বলতেন-'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজুবিকা মিনাল খুবসি ওয়াল খবা-ইস' অর্থ: 'হে আল্লাহ, আমি পুরুষ ও মহিলা জিন (এর অনিষ্ট) হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (ছহিহ বুখারী হা: ১৪২)

৭। পায়খানায় প্রবেশের সময় বাম পা আগে ও বের হওয়ার সময় ডান পা আগে রাখতে হবে। আবূ মালিক কালাম বিন আস সাইয়্যিদ সালিম (রহিঃ) বলেন, এ ব্যাপারে আমি নবী ﷺ এর পক্ষ থেকে স্পষ্ট কোন দলীল পাইনি। তবে

ইমাম শাওকানী (রহিঃ) 'আস-সাইলুল জাররার' গ্রন্থে (১/৪৬) তা উল্লেখ করেছেন। প্রবেশের সময় বাম পা আগে ও বের হওয়ার সময় ডান পা আগে রাখার কারণ হল, সম্মানিত কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা হয় আর অসম্মানিত কাজ বাম দিক থেকে শুরু করা হয়। এর প্রমাণ বর্ণিত আছে। (ফিকহুস সুন্নাহ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৬৫)

৮। মলমূত্র ত্যাগ করার জন্য বসার সময় ক্বিবলাকে সামনে বা পেছনে রাখা যাবে না। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন- যখন তোমরা পায়খানা করতে যাও, তখন কিবলার দিক মুখ করবে না কিংবা পিঠও দিবে না, বরং তোমরা পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে। আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ) বলেন, আমরা যখন সিরিয়ায় এলাম তখন পায়খানাগুলো কেবলামুখী বানানো পেলাম। আমরা কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। (ছহিহ বুখারী, হাঃ ৩৯৪)।

পাঠক বন্ধুঃ আমরা বাংলাদেশীদের জন্য সাধারণত পশ্চিম দিকেই ক্বিবলা মানি, কাজেই আমাদের জন্য পশ্চিম দিকে মুখ বা পিঠ করে পায়খানা করা অনুচিত। আমাদের জন্য উত্তর-দক্ষিণ হয়ে পায়খানায় বসা সঠিক। আবূ মালিক কামাল বিন আস সাইয়্যিদ সালিম (রহিঃ) বলেন, সাধারণ ভাবে ক্বিবলাকে সামনে বা পেছনে করা হারাম। (ফিকহুস সুন্নাহ, প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৬৭)

৯। প্রস্রাব-পায়খানায় বসে প্রয়োজন ছাড়া কোনো কথা-বার্তা বলা যাবে না; হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ প্রস্রাব করছিলেন, এমন সময় এক ব্যাক্তি পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়, সালাম দিলে তিনি তার সালামের জবাব দিলেন না। (মুসলিম হাঃ ৩৭০; তিরমিযী ১/১৫)।

সালামের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব অথচ নবী ﷺ প্রস্রাব করার সময় সালামের উত্তর দিলেন না। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে এ অবস্থায় কথা বলা হারাম। বিশেষত এসময় আল্লাহর যিকর থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে একান্ত জরুরি কথা বলা

যাবে। যেমনঃ- কোন ব্যাক্তিকে পথের সন্ধান দেওয়া, পানি চেয়ে নেওয়া অথবা অনুরূপ কিছু। এটা জরুরী ভিত্তিতে বৈধ। "আল্লাহই সর্বাধিক অবগত"।

১০। প্রস্রাব করার সময় নরম ও নিচু জায়গা খুঁজে নিতে হবে। শক্ত জায়গা নির্বাচন করা যাবে না; কারন নাপাকী শরীরে ছিটকে পড়তে পারে।

১১। মলমূত্র ত্যাগের পর বের হবার সময় 'গুফরা নাকা' পড়তে হবে। হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ মলমূত্র ত্যাগের পর বের হওয়ার সময় বলতেন 'গুফরা নাকা' হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই। (তিরমিযী হাঃ ৮; আবু দাউদ হাঃ ৩০)

✍ মিসওয়াক করাঃ

মিসওয়াক আভিধানিক অর্থ- ঘষা, মাজা, মর্দন করা ইত্যাদী।

পরিভাষায়ঃ দাঁত থেকে হলুদ বর্ণ বা এ জাতীয় ময়লা দূর করার জন্য কাঠ বা গাছের ডাল ব্যবহার করাকে মিসওয়াক বলে। (নাইলূল আওতার ১/১০২) সর্বদা মিসওয়াক করা মুস্তাহাব, হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন- মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ ও আল্লাহর সন্তোষ লাভের উপায়। (সুনানে নাসায়ী হাঃ ১/৫০)

✍ যে সকল সময়ে মিসওয়াক করা উত্তম বলে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছেঃ

১। গৃহে প্রবেশের সময়ঃ

হযরত আল মিকদাম ইবনু শুরাইহ তার পিতার সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর রসূল ﷺ ঘরে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম কোন কাজ করতেন? তিনি বলেন, মিসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজা। (ফিকহুস সুন্নাহ, প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৭৮)

২। কুরআন পাঠের সময়:

হযরত আলী (রা:) বলেন, আমাদের মিসওয়াক করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা যখন কোন বান্দা ছলাতে দাঁড়ায় তখন তার কাছে ফেরেশতা এসে তার পিছনে দাড়ায় ও কুরআন পড়া শুনতে থাকে এবং তার নিকটবর্তী হতে থাকে, এমনকি ফেরেশতা তার মুখকে তিলাওয়াতকারীর মুখের সাথে লাগিয়ে দেয়। ফলে প্রত্যেক আয়াত ফেরেশতার মুখের ভিতর প্রবেশ করে। (বাইহাকী ১/৩৮)

৩। অযূর সময়:

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রসূল (সাঃ) বলেছেন- যদি উম্মাতের জন্য কষ্ট মনে না করতাম, তাহলে আমি অযূর সময় তাদের মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম। (ছহীহ আল জামে, হাঃ ৫৩১৬)

৪। ছলাতের সময়:

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন- যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্ট মনে না করতাম, তাহলে আমি প্রত্যেক ছলাতের সময় তাদের মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম। (ছহিহ বুখারী, হাঃ ৬৮১৩)

৫। তাহাজ্জুদ ছলাতের সময়:

হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন তাহাজ্জুদ ছলাতের জন্য উঠতেন তখন মিসওয়াক দ্বারা ঘষে মুখ পরিষ্কার করতেন। তথা তার দাঁতগুলো মিসওয়াক দ্বারা ঘষতেন। (ছহিহ বুখারী হাঃ ২৪৬)

✍ নখকাটাঃ

নখকাটা, ১০টি স্বভাবজাত সুন্নাতের একটি। নখ ছেড়ে রাখা বৈধ নয়। কেননা মানুষ একটি সভ্যজাতি। আর সেই সভ্যজাতি বিশেষ করে কোন মুসলিম অসভ্য পশুর ন্যায় হতে পারে না।

হিংস্র জানোয়ারেরাই কেবল নখ ছেড়ে রাখে। কাজেই একজন সভ্য মানুষ কখনই কোন হিংস্র পশুর সাদৃশ্য হতে পারে না। বর্তমানে এমন অনেক তরুণ-তরুণীদেরই দেখা যায়, যারা শখের বশবর্তী হয়ে হাত-পায়ের বিশেষ করে হাতের নখ রেখে দেয়।

এমনও তরুণ-তরুণী আছে যারা, হাতের সমস্ত নখ না রেখে দিলেও অন্তত হাতের বৃদ্ধা ও কণিষ্ঠা আঙ্গুলের নখ রেখে দেয়। আবার অনেকেই এমন আছে সব নখ কাটলেও বাম হাতের কণিষ্ঠা আঙ্গুলের নখ রেখে দেয়। হয়তো তা সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য। কিন্তু তা সৌন্দর্যকে হ্রাসই করে। আর ইসলাম মুসলমানদের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যেন, কোন মুসলমান সর্বোচ্চ ৪০ দিনের বেশি তা না রাখে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের জন্য গোঁফ খাটো করা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়িয়ে ফেলা ও নাভীর নিচের পশম মুন্ডন করার জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখা বেধে দিয়েছেন, আমরা যেন তা চল্লিশ রাতের বেশি ছেড়ে না রাখি। (মুসলিম হাঃ ২৫৭)

কাজেই কোন মুসলমানের জন্য বৈধ হবে না, ইসলামের নিষেধাজ্ঞাকে অবজ্ঞা করে চল্লিশ রাতের বেশি নখ ছেড়ে রাখা। তবে চল্লিশ দিনের পূর্বেই নখ কাটার প্রয়োজন বোধ হলে নখ কাটা উত্তম।

✍ নখ কাটার নিয়মঃ

পাঠক বন্ধু, নখ কাটার জন্য নিয়ম হলো হাতের নখ কাটার সময় প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাতের নখ কাটতে হয়। পায়ের নখ কাটার সময়ও অনুরূপ প্রথমে ডান পায়ের নখ ও পরে বাম পায়ের নখ কাটা হয়। যে কোন কাজ ডান দিক থেকে শুরু করার একাধিক প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। (আস সাইলুল জাররার ১/৪৬)

তবে কোন আঙ্গুলের নখ আগে কাটতে হবে, আর কোন আঙ্গুলের নখ পরে কাটতে হবে তার কোন দলিল উল্লেখ নেই। যেমনঃ প্রথমে ডান হাতের কণিষ্ঠা,

তার পরে মধ্যমা, তার পর বৃদ্ধা, তারপর অনামিকা, তারপর তর্জনী, তারপর বাম হাতের বৃদ্ধা অথবা প্রথমে ডান হাতের কনিষ্ঠা, তারপরে অনামিকা, তার পরে মধ্যমা, তারপরে তর্জনী, তার পরে বৃদ্ধা, তারপর বামহাতের বৃদ্ধ বা কণিষ্ঠা আঙ্গুলি দিয়ে কাটা শুরু করা এই নিয়মগুলোর কোন ভিত্তি নেই। হযরত ইবনে দাক্বীক্বুল ঈদ (রহিঃ) বলেন, শরীয়তে এর কোন দলিল নেই। এই ভাবে নখ কাটা মুস্তাহাব হওয়ার কথা বিশ্বাস করা যায়েজ নয়। যেহেতু কোন কিছুকে মুস্ত-াহাব মনে করা শারয়ী বিধান। আর তা প্রমাণের জন্য দলীল জরুরী। (ইসলামী জীবনধারা, পৃঃ ৬৭; কাশশাফুল ক্বিনা ১/৯৪)

নখ কাটার পর হাত ধোয়ায় যদি স্বাস্থ্যগত কোন উপকার থাকে, তাহলে তা করতে কোন নিষেধ নেই। কিন্তু তা সুন্নাত বা মুস্তাহাব মনে করে করলে তারও দলিল থাকা জরুরী।

জানা প্রয়োজন যেঃ জিহাদীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে নখ লম্বা রাখা হারাম নয়। (কাশশাফুল ক্বিনা ১/৯৪-৯৬)

✍ গোঁফ তথা মোচ খাটো করাঃ

পাঠক বন্ধু! গোফ খাটো করাও মানুষের স্বভাবজাত সুন্নাত।

পুরুষের নিচের ঠোটে দাড়ি থাকবে এবং উপরের ঠোটে থাকবে মোচ। আর এই মোচ অবশ্যই ছেটে ছোট করে রাখতে হবে। এটাই মানুষের জন্য সৌন্দর্য্য। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, তোমরা দাড়ি ছেড়ে দাও, মোচ ছেটে ফেলো। (ছহিহুল জামে হাঃ ১০৬৭)

পাঠকবন্ধু, অথচ মানুষের মধ্যে দেখা যায় অত্র হাদিসের বিপরীত আমাল, একশ্রেণীর মানুষ আছে যারা দাড়ি ছাটে বা চাছে আর গোফ ছেড়ে দেয়। আমি বিশেষ করে মুসলমানদের কথাই বলছি, কাজেই প্রতিটি মুসলমানদের আমল হতে হবে মোচ ছেটে দাড়ি রেখে দেওয়া।

যারা মোচ ছাটে না, রেখে দেয় সেই সকল মুসলমানদের ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন-"যে ব্যাক্তি তার মোচ ছাটে না, সে আমার দলভুক্ত নয়। (তিরমিযী হা: ২৭৬২; ছহিহুল জামে হা: ৬৫৩৩) অতএব মুসলমানদেরকে অবশ্যই বড় বড় মোচ রাখা থেকে বিরত থাকতে হবে।

তবে বর্তমান সমাজে যেই কথাটি চালু আছে 'মোচের পানি হারাম' সেই ব্যাপারে শাইখ আব্দুল হামিদ মাদানি আল ফায়জী (হাফিজাহুল্লাহ) বলেন, 'মোচ লম্বা হলে পানি বা অন্য কিছু পান করার সময় মোচের সাথে স্পর্শ হলে তা হারাম হয়ে যায় না। কারণ "মোচের পানি হারাম" কথাটির দলীল পাওয়া যাচ্ছে না। (ইসলামী জীবনধারা, পৃ:৫৯)

✍ গোঁফ ছাটার নিয়মঃ

পাঠক বন্ধুঃ মুসলমানদের মধ্যেই মোচ বিষয়ে দুইটি শ্রেণী দেখা যায়, যার এক শ্রেণার লোকেরা মোচ বড় বড় রাখে আবার আরেক শ্রেণীর লোক দেখা যায়, যারা মোচ খুর অথবা বেড দিয়ে চেচে ফেলে। এই দুইটি নিয়মের একটিও সঠিক নয়ঃ বরং দুইটিই হাদিসের বিপরীত আমাল। আমি মোচ ছাটার ব্যাপারে হাদিসটি আবার উল্লেখ করছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন- তোমরা দাড়ি ছেড়ে দাও, মোচ ছেটে ফেলো। (ছহিহুল জামে, হা: ১০৬৭)

এখন উপরে উল্লিখিত হাদিসটির বাস্তব আমাল আমরা জেনে নেই নবী ﷺ এর সাহাবী মুগীরাহ বিন শো'বা (রাঃ) কে (ঠোটের নিচে) দাতন রেখে মোচ ছাটার নির্দেশ দিয়েছেন। অথবা তিনি নিজে মুগীরার মোচ ঐভাবে ছেটে দিয়েছেন। (আবূ দাউদ, হা: ১৮৮)

অতএব এখন বুঝতেই পারছেন মোচ যদি খুর বা বেড দিয়ে চেছে ফেলা সঠিক হতো তবে, আল্লাহর রসূল ﷺ মাথা মন্ডনের মতো মোচও খুর দিয়ে চেছে ফেলতে বলতেন। আর সেই সময় খুরও ছিলো। অথচ আল্লাহর রসূল ﷺ মুগীরাহ

(রাঃ) কে ঠোটের নিচে দাতন রেখে, মোচ ছাটার নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই মোচ রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বড়ও রাখা যাবে না।

✍ দাড়ি লম্বা করাঃ

পাঠক বন্ধু! ইসলামে দাড়ি লম্বা করার বিধান হলো- পুরুষদের জন্য দাড়ি লম্বা করা ওয়াজিব। আর ওয়াজিব ইসলামে এমন একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় যা, পালন না করলে অবশ্যই গোনাহগার হতে হবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে মুসলমানদের মাঝে দাড়ি চাছা, দাড়ি ছেটে একেবারেই ছোটা ছোট করা একটি মহামারী হিসেবে দেখা দিয়েছে। আশ্চর্যজনক বিষয় হল, অধিকাংশ মুসলমান দাড়িকে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনেই করে না। তারা মনে করে দাড়ি চাছা, বা দাড়ি রাখা তা নিজের ইচ্ছাধীন ব্যাপার। ইচ্ছা হলে দাড়ি রাখতে পারি, আবার ইচ্ছা হলেই দাড়ি চাছতে পারি। আহ! কি আফসোসের বিষয়! মুসলমান দাড়িকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই মনে করল না। অথচ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন (দাড়ি ও গোফের ব্যাপারে) তোমরা মুশরিকদের বিপরীত কর। দাড়ি লম্বা কর এবং গোফ ছোট কর। (ছহিহ বুখারি হাঃ ৫৮৯২; মুসলিম হাঃ ২৫৯)

অন্য এক হাদিসে নবী ﷺ বলেছেন- তোমরা গোফ কাটো এবং দাড়ি লম্বা করো, আর অগ্নি পূজকদের বিরোধিতা করো। (মুসলিম হাঃ ২৬০)।

হে মুসলমানঃ একটি বার চিন্তা করে দেখুন, যেখানে আল্লাহর রসূল ﷺ দাড়ির ব্যাপারে বলেন যে, মুশরিক, কাফেররা দাড়ি রাখে না, দাড়ি চাছে, দাড়ি একেবারেই ছোট ছোট করে রাখে কাজেই মুসলমানরা যেন তাদের বিরোধিতা করে অর্থাৎ দাড়ি না চেছে, না ছোট করে, লম্বা করে রাখে। আবু মালিক কামাল বিন আস-সাইয়্যিদ সালিম (রহিঃ) বলেন, নবী ﷺ দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশটা ওয়াজিব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (ফিকহুস সুন্নাহ, প্রথম খন্ড, ১ম পর্ব, পৃঃ ১৮০)

যেখানে আল্লাহর রসূল ﷺ দাড়ি রাখার জন্য ওয়াজিব অর্থে নির্দেশ করলেন, সেখানে এক শ্রেণীর মুসলমান যদিও তাদের সংখ্যাটি বেশি, তারা আল্লাহর নবী ﷺ এর নির্দেশকে অমান্য করে দাড়ি চাছলো বা দাড়ি ছেটে একেবারেই ছোট ছোট করে রাখল, তাহলে কি ভেবে দেখেছেন?

মুসলমানদের কতোটা অবনতি হয়েছে! আর এই অবনতিকে তুচ্ছভাবে ধরলে হবে না। কেননা, এই দাড়ি চাছা, দাড়ি ছেটে ছোট ছোট করা কোন তুচ্ছ ব্যাপার নয়; বরং তা সকল নবী-রসূলের আমলের বিরোধীতা, আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের উপর যা স্বভাবজাত পদ্ধতি, সেই পদ্ধতির বিরোধীতা করা, আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর নির্দেশের বিরোধীতা। কাজেই দাড়ি চাছা, দাড়ি ছোট ছোট করা স্পষ্ট হারাম।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, দাড়ি মুন্ডন করা হারাম। (ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যাহ, পৃ:১০)

ইমাম ইবনে হাযম ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, দাড়ি মুন্ডন করা হারাম এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। (মায়াতীবুল ইজম, রাদ্দুল মুহতাব ২/১১৬)

অতএব যা হারাম তা থেকে অবশ্যই মুসলমানদেরকে দুরে থাকতে হবে। কেননা- হারাম পথের শেষ গন্তব্য হল জাহান্নাম। আর সে পথের পরিচালক হল অভিশপ্ত শয়তান।

✍ দাড়ি চাছলে বা একেবারেই ছোট ছোট করলে শয়তান খুশি হওয়ার কারণ:

পাঠক বন্ধু! দাড়ি চাছলে বা ছোট করলে শয়তান খুশি হবার একটি কারণ নয়; বরং একাধিক কারণ রয়েছে, আর সেই কারণগুলো আমি নিচে উল্লেখ করলাম-

(ক) দাড়ি লম্বা রাখা মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট থেকে নির্ধারিত স্বভাবজাত সুন্নাত। যা পালন করলে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন। যেই কাজ করলে আল্লাহ তার বান্দাদেরকে ভালোবাসে, বান্দার প্রতি খুশি হবেন, বান্দাকে আল্লাহ পুরস্কৃত করবেন, সেই কাজেই শয়তান অখুশি হবে। কারণ শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (২/১৬৮) কাজেই শয়তান কখনোই মানুষের ভালো কিছু কামনা করবে না। একটু স্থির হয়ে বুঝে দেখুন, কুরআন মাজিদে শয়তানের বর্ণনা কিভাবে এসেছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ﴿﴾

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿﴾

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿﴾

অর্থ: "সে বলল (অর্থাৎ শয়তান বলল) (হে আল্লাহ!) তুমি আমাকে শাস্তি দান করিলে, এ জন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চয় ওৎ পাতিয়া থাকিবো। অত:পর আমি তাদের নিকট আসিবই তাহাদের সামনে, পেছনে, ডান ও বাম দিক হইতে এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাইবে না। তিনি বললেন, (অর্থাৎ আল্লাহ বলিলেন) এই স্থান হইতে ধিক্কৃত ও বিতারিত অবস্থায় বাহির হইয়া যাও। মানুষের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিবই।" (সূরাহ আ'রফ, আ: ১৬-১৮)

পাঠক বন্ধু: এখন ভেবে দেখুন! কোন মুসলমান যখন স্বভাবজাত সুন্নাত পালন করে অর্থাৎ দাড়ি লম্বা রাখে, তখন সেই বান্দাকে আল্লাহ ভালোবাসেন, কারণ সেই বান্দার প্রতি আল্লাহ খুশি হন, ফলে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে পুরষ্কার দিবেন এটাই শয়তানের জন্য কষ্টের ব্যাপার। যেই মানুষের সাথে হিংসা করে শয়তান বিতাড়িত হয়েছে, সেই মানুষকে আল্লাহ পুরষ্কার দিবেন, এটা শয়তানের মেনে নেওয়া কষ্টকর। তাই শয়তান বিভিন্ন ভাবে ষড়যন্ত্র করতে থাকে কিভাবে মানুষকে আল্লাহর অভিশাপের মধ্যে পতিত করা যায়।

যেহেতু দাড়ি লম্বা রাখলে আল্লাহ খুশি হন আর শয়তান অখুশি হয়, তাই শয়তান মানুষকে দাড়ি চাছার বা ছেটে ছোট করার পরামর্শ দেয়। আর যখন মানুষ দাড়ি চাছে বা ছেটে ছোট করে, তখন সে বান্দার প্রতি আল্লাহ অখুশি হন, ফলে শয়তান খুশি হয়।

(খ) দাড়ি লম্বা রাখা স্বভাবজাত সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। যা সকল নবীগণ পছন্দ করেছেন। আর নবীগণের পছন্দের বিষয়সমুহই শয়তানের অন্তর জ্বালার কারণ। কাজেই যখন মুসলমানগণ নবী (আঃ) গণের অনুসরণ করে দাড়ি লম্বা রাখে, ঠিক তখন শয়তান ঐ মুসলিমের নবীদের অনুসারী হয়ে আমল করার কারণে অর্থাৎ দাড়ি লম্বা রাখার কারণে শয়তান অখুশি হয়। আর যখন কোন মুসলিম বান্দা পৃথিবীর শ্রেষ্ট মানবগণ অর্থাৎ নবী (আঃ) এর পছন্দকে অবজ্ঞা করে দাড়ি চাছে অথবা দাড়ি ছেটে ছোট ছোট করে, তখন ঐ বান্দার প্রতি শয়তান খুশি হয়।

(গ) দাড়ি লম্বা রাখার জন্য প্রত্যেক মুসলিমদের প্রতিই আল্লাহর রসূল ﷺ নির্দেশ রয়েছে, কাজেই যখন কোন মুসলিম বান্দা আল্লাহর ও তার রসূল ﷺ এর নির্দেশ অমান্য করে অর্থাৎ অবাধ্য হয়ে দাড়ি চাছবে অথবা দাড়ি ছেটে ছোট ছোট করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান ঐ মুসলিম বান্দার প্রতি খুশি হয়।

ফলে শয়তানের অনুসারী ঐ বান্দার প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿٨٠﴾

অর্থ: "যে রাসুলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে বিমুখ হলো, তবে আমি (হে রসূল) তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে প্রেরণ করিনি।" (সূরাহ নিছা, আ: ৮০)

(ঘ) যদি কোন মুসলিম বান্দা আল্লাহর রসূল ﷺ এর আনুগত্য সঠিকভাবে করে তবে সে নি:সন্দেহে মহান আল্লাহ তা'য়ালার পুরষ্কার প্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অনুরূপভাবে যদি কেহ আল্লাহর রসূল ﷺ এর

বিরুদ্ধাচরণ করে অর্থাৎ আল্লাহর রসূল ﷺ যে আমল করেছেন এবং মুসলমানদের করতে বলেছেন তা না করে, উল্টোটা করে, সে ব্যক্তিও নি:সন্দেহে আল্লাহর শাস্তি প্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۗ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿۱۱۵﴾

অর্থ: "আর যে রাসূলের বিরুদ্ধ-আচরণ করবে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মু'মিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফিরাবো যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাবো জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ।" (সূরাহ নিছা, আ: ১১৫)

যেহেতু দাড়ি লম্বা রাখা আল্লাহর রসূল ﷺ এর নির্দেশ এবং তা প্রত্যেক মুমিনগণই পালন করেন। সেহেতু দাড়ি লম্বা না রেখে চেছে ফেললে অথবা ছেটে ছোট ছোট করলে রসূল ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণ হবে এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথের অনুসরণ করা হবে। যা আল্লাহর নিকট অখুশির কারণ। আর অভিশপ্ত শয়তানের খুশির কারণ। অর্থাৎ দাড়ি চাছলে বা ছেটে ছোট করলে আল্লাহর রসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে যাওয়া হয়। আর এজন্যই নিকৃষ্ট শয়তান খুশি হয়।

(ঙ) দাড়ি চাছার মাধ্যমে অভিশপ্ত শয়তানকে আল্লাহর সাথে শরীক করা হয়, যা কবিরাহ গোনাহ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿۴۸﴾

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ তাহার সঙ্গে শরীক করা ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতিত অন্যান্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; এবং যে কেহ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।" (সূরাহ নিছা, আ: ৪৮)

দাড়ি চাছার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সাথে যেভাবে শরীক করেঃ এ কথা দিনের আলোর মতো সত্য যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালাই একমাত্র স্রষ্টা, আর তিনি নারী ও পুরুষকে কিছু ভিন্নভাবে সৃষ্টি করেছেন। এই সকল কিছু ভিন্নতার মধ্যে একটি হলো গোঁফ ও দাড়ি। যা আল্লাহ তা'য়ালা পুরুষের জন্যই বিশেষভাবে দিয়েছেন। কিন্তু নারীর জন্য তা দেন নি অর্থাৎ এই সকল কিছু ভিন্নতা দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা নারী ও পুরুষকে আলাদা সৌন্দর্য্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই যখন কোন মুসলিম পুরুষ আল্লাহর সেই সৃষ্টিকে অপছন্দ করবে, যেমন আল্লাহ তাকে দাড়ি দিয়েছেন, কিন্তু তার দাড়ি পছন্দ নয়। যার জন্য সে তার দাড়িকে চেছে নারীদের অবয়ব ধারন করে। নি:সন্দেহে সে কবিরাহ গোনাহ করে ফেলবে। আর শয়তান সকল সময়ই চায় মুসলমান তার চেহারার পরিবর্তন করুক। অর্থাৎ নারী পুরুষের অবয়ব ধারন করুক। আর পুরুষ নারীর অবয়ব ধারন করুক। কারণ এটা আল্লাহ অপছন্দ করেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾ ط

অর্থ: "(শয়তান বলেছে) অবশ্যই তাদেরকে অর্থাৎ (শয়তানের অনুসারী) মানুষদেরকে আদেশ করব, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে।" (সূরাহ নিছা, আ: ১১৯)

অতএব, এই কাজটি করলে নিকৃষ্ট শয়তান খুশি হয়।

পাঠক বন্ধু! এখন আপনিই চিন্তা করে দেখুন যারা দাড়ি চাছে কিংবা দাড়ি ছেটে ছোট করে, তারা কিভাবে শয়তানকে খুশি করে? কাজেই দাড়ি চাছা বা ছেটে ছোট করার মতো হারাম কাজ থেকে অবশ্যই অবশ্যই প্রতিটি মুসলমানকে বিরত থাকা জরুরি।

অতএব, বিতারিত শয়তান হতে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি-

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ﴿۳﴾
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿۴﴾ الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴿۵﴾
مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾

অর্থ: “বল, আমি আশ্রয় নিতেছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহের নিকট, আত্মগোপনকারী (শয়তানের) কুমন্ত্রনার অনিষ্ট হতে, যে কুমন্ত্রনা দেয় মানুষের অন্তরে, জিনের মধ্যে হতে এবং মানুষের মধ্যে হতে।” (সূরাহ নাছ, আ: ১-৬)

✍ দাড়ি রাখা নিয়ে চার প্রকার অবস্থা চলমান:

পাঠক বন্ধু: যদিও আমি পূর্বে স্পষ্ট করেছি দাড়ি লম্বা রাখা ওয়াজিব এবং তা চাছা কিংবা ছোট করা হারাম। অতএব, দাড়ি লম্বা রাখা ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে দাড়ি রাখা নিয়ে (আমি বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের কথা বলছি) চার প্রকার অবস্থা চলমান। আর তা হলো-

১। দাড়ি খুর বা বেড দিয়ে চাছা।

২। দাড়ি কেচি দিয়ে ছেটে একেবারেই ছোট করা।

৩। একমুষ্টি দাড়ি রেখে বাকি দাড়ি ছেটে ফেলা।

৪। দাড়ি লম্বা রাখা।

পাঠক বন্ধু! উপরের ১নং ও ২নং বিষয়টি নিয়ে আমি পুনরায় আলোচনা করা অপ্রয়োজন মনে করছি। কেননা উপরের উল্লেখিত ২টি প্রকারই স্পষ্ট হারাম। যারা উপরে উল্লেখিত ঐ দু’প্রকার দাড়ি পছন্দের পক্ষ রাখেন বা দাড়ি খুর কিংবা বেড দিয়ে চাছে এবং দাড়ি কেচি দিয়ে ছেটে একেবারেই ছোট ছোট করে রাখে

কিংবা একমুষ্টি দাড়ির চেয়ে ছোট রাখে, তারা সকলেই গোনাহগার। তারা সকলেই হারাম কাজে লিপ্ত আছে। আল্লাহ তাদেরকে মাফ করুন। (আমীন)

এখন আলোচনা হলো উল্লেখিত নিচের দুটি প্রকার নিয়ে-

১। একমুষ্টি দাড়ি রেখে বাকি দাড়ি ছেটে ফেলা।

২। দাড়ি লম্বা রাখা।

প্রথমটি- একমুষ্টি দাড়ি রেখে বাকি দাড়ি ছেটে ফেলা প্রসঙ্গে।

পাঠক বন্ধুঃ দাড়ি লম্বা রাখা ওয়াজিব। কিন্তু তা সর্বনিম্ন কতটুকু দাড়ি লম্বা রাখা ওয়াজিব, তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। এক শ্রেণীর বিদ্বানের মতে একমুষ্টি দাড়ি রেখে বাকিটুকু ছেটে ফেলা জায়েজ রয়েছে। আরেক শ্রেনীর বিদ্বানের মতে কোন ক্রমেই দাড়ি না ছেটে লম্বা রাখা ওয়াজিব।

পাঠক বন্ধু! উভয়ের কোন শ্রেণীরই পক্ষপাতিত্ব না করে সঠিকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায়, এ দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানটিই উত্তম তা হলো-

দাড়ি লম্বা করার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিতে হবে। কেননা, আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন- তোমরা গোঁফ কাট এবং দাড়ি লম্বা কর, আর অগ্নি পূজকদের বিরোধিতা কর। (মুসলিম, হাঃ ২৬০)

আর প্রয়োজনবোধে এক মুষ্টি দাড়ি রেখে বাকি অংশ কেটে ফেলা যাবে। যেমনঃ ইবনে সিরিন এবং আল হাসান (রহিঃ) কে জিজ্ঞস করা হলে, তারা বলেন, দাড়ির দৈর্ঘ্য ছাটলে কোন সমস্যা নেই। (ইবনে শায়বা, হাঃ ২৫৪৮৯)

পাঠক বন্ধু! এখানে একটি বিষয় হল, যারা দাড়ি লম্বা কর, "হাদিসকে দলিল হিসেবে নিয়ে দাড়ি লম্বা করতে হবে, যতদুর দাড়ি যাবে" বলে বাড়াবাড়ি করেন। তাদের এই বাড়াবাড়ি সঠিক নয়। তাদের ব্যাপারে শাইখ আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী (রহিঃ) এর উপসংহার- সুতরাং বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, দাড়ি

ছাটার অনুমতি আছে। আর তা সালাফদের অনেকের মধ্যে প্রচলিত ছিল, যা সবার জানা।

এটি তাদের বিপরীত যারা "দাড়ি ছেড়ে দাও" এর উপর ভিত্তি করে দাড়ি ছাটার ঘোর বিরোধী। কিন্তু তারা বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারেনি। ছহিহ বুখারী ও মুসলিম এ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার থেকে এবং মুসলিমে আবু হুরাইরা থেকে 'দাড়ি ছেড়ে দাও' হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। অথচ ইবনে উমার ও আবু হুরায়রা দাড়ি ছাটতেন আর তারা রসূল ﷺ এর হাদিস সম্পর্কে অধিক অবগত, যারা শ্রবণ করেননি তাদের চেয়ে। (সিলসিলাহ আদ্ব-দ্বয়ীফা ৩/৩৭৫)

পাঠক বন্ধু: উপরে উল্লেখিত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, দাড়ি ছাটা যাবে, কিন্তু কখন ছাটা যাবে এবং কোন পরিমাণে ছাটা যাবে, তা উপরের আলোচনায় স্পষ্ট নয়। কাজেই আমি নিচে তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করার চেষ্টা করলাম।

✍ দাড়ি কোন পরিমাণে ছাটা যাবে এবং তা কখন যাবে?

পাঠক বন্ধু! দাড়ি ছাটা যাবে, এমন আলোচনা দেখে যারা ছাটায় পারদর্শী তারা হয়তো একটু মনে মনে খুশিই হবেন। কিন্তু দাড়ি ছাটারও যে একটা সময় আছে এবং দাড়ির নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে সেটাও মাথায় রাখা লাগবে। দাড়ি ছাটার হাদিস আর কিছু আলোচনা দেখেই দাড়ি ছাটার জন্য লাফিয়ে দাঁড়ালে হবে না। উপরে উল্লেখিত শাইখ আলবানী (রহি:)-এর উপসংহারে উল্লেখিত হয়েছে যে, সকল সাহাবীগণ (রাঃ) আলোচ্য বিষয়ে হাদিস সম্পর্কে অধিক অবগত, যারা শ্রবণ করেননি তাদের চেয়ে। এখন আমাদেরকে সেই সকল সাহাবীদের আমল থেকেই দাড়ি রাখার বা ছাটার বাস্তব শিক্ষা নিতে হবে। দাড়ি ছাটার ব্যাপারে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইবনে উমার (রাঃ) যখন হাজ্জ ও উমরা করতেন তখন দাড়ি ধরে অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলতেন। (ছহিহ বুখারী হা: ৫৮৯২)।

উপরের উল্লেখিত আছার থেকে দাড়ি কখন ছাটা যাবে তা স্পষ্ট হয়েছে, তা হল হাজ্জ ও উমরার সময় দাড়ির অতিরিক্ত অংশ ছাটা যাবে। কিন্তু দাড়ি লম্বা রাখার সর্বনিম্ন পরিমানটি এই আছারে উল্লেখ হয়নি। তবুও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে, হাজ্জ ও উমরার সময় দাড়ির অতিরিক্ত অংশ ছাটা যায়।

এ বিষয়ে আরো আছার বর্ণিত হয়েছে- যেমনঃ হযরত সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার যখন ইহরাম বাধিতে ইচ্ছা করতেন, তখন উটে আরোহণ এবং ইহরাম বেধে তালবিয়া পাঠ করার পূর্বে কাচি আনাইয়া মোচ এবং দাড়ি ছাটিয়া নিতেন। (মুয়াত্তা মালিক, হাজ্জ অধ্যায়, চুল ছাটা প্রসঙ্গে, ২০/১৯০)

অতএব, দাড়ি ছাটার বিষয় নিয়ে যতো আছার বর্ণিত হয়েছে তার অর্ধাংশই হাজ্জ ও উমরাকে কেন্দ্র করে।

কাজেই কোন মুসলমান পুরুষ যদি দাড়ি ছেটে ছোট করতে চায় তবে হাজ্জ ও উমরার সময়ই করবে। তবে হ্যাঁ, যদি কোন মুসলিম পুরুষের দাড়ি এতোটাই লম্বা হয়ে যায় যা তার জন্য কষ্টের কারণ হয়, কিংবা সেই দাড়ি ভারসাম্যের বাহিরে হয়, তবে সেই ব্যক্তি এমন কারণবশত; দাড়ি ছেটে ছোট করতে পারবে। যেমন ইবনে সিরিন এবং আল হাসান (রহিঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে, তারা বলেন, দাড়ি দৈর্ঘ্যে ছাটলে কোন সমস্যা নেই। (ইবনে আবী শাইবা, হাঃ ২৫৪৮৯)
অর্থাৎ কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণবশতঃ লম্বা দাড়ি কেটে ছোট করা যায়েজ আছে। কিন্তু এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছাড়াই দাড়ি ছোট করা অনুচিত।

পাঠক বন্ধু! কোন কারণবশত লম্বা দাড়ি ছাটা যাবে এবং কখন তা কাটা যাবে সেই বিষয়টি উপরে উল্লেখিত হয়েছে।

এখন জানা প্রয়োজন দাড়ি কোন পরিমাণে ছাটা যাবে, ইবনে আবী শাইবা-তে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা এক মুষ্টির অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলতেন। (ইবনে আবী শাইবা, হাঃ ২৫৪৮৮)

অতএব বোঝাই যাচ্ছে দাড়ি কাটার সর্বনিম্ন স্থান হলো একমুষ্টির উপরে, তার নিচের দাড়ি কাটা যাবে না, কাটা হারাম। এখানে একটি কথা অবশই স্মরণে রাখতে হবে যে, আল্লাহর রসূল ﷺ এর আদেশ সূচক হাদিস "দাড়ি ছেড়ে দাও" এটা আবু হুরায়রা (রাঃ) সহ অন্যান্য সাহাবী, তাবেঈগণের আমল।

এখানে একটি কথা অবশ্যই স্বরণে রাখতে হবে যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) সহ অন্যান্য সাহাবী, তাবেঈগণের আমাল তথা একমুষ্টির উপরে দাড়ি ছাটা। কখনোই আল্লাহর রসূল ﷺ এর সেই হাদিসের বিপরীত আমল নয়ঃ যেই হাদিসে আল্লাহর রসূল ﷺ নির্দেশ করেছেন-"দাড়ি ছেড়ে দাও।"

কারণ সাহাবীগণ রসূল ﷺ এর হাদিস সম্পর্কে অধিক অবগত। কাজেই আল্লাহর রসূল ﷺ এর নির্দেশ সূচক হাদিস এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ও হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর আমলের সমঝোতা হলো, সর্বনিম্ন এক মুষ্টির দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং সর্বনিম্ন একমুষ্টি লম্বা দাড়ি রাখা যায়।

অতএব দাড়ি লম্বা রাখ এবং একমুষ্টি দাড়ি রেখে বাকি অংশ ছেটে ফেলা এর মধ্যে মধ্যবর্তী অবস্থান হল, দাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। অকারনে দাড়ি কাটা যাবে না, মুকিম অবস্থায় ছলাত কছর করলে যেমন হবে না, হাজ্জ ও উমরা ব্যতিতও দাড়ি ছেটে একমুষ্টি করা যাবে না। তবে হ্যাঁ, যদি দাড়ি লম্বা রাখা ব্যক্তির জন্য খুবই কষ্টকর হয়, তাহলে ভিন্ন ব্যাপার।

কিন্তু এক মুষ্টির নিচে কোন ক্রমেই দাড়ি ছাটা যাবে না, এটা হারাম।

বর্তমান সময় দাড়ি মুন্ডন করা কিংবা দাড়ি কেটে একেবারেই ছোট ছোট করা মুসলমানদের মধ্যে মহামারি আকার ধারন করেছে। এই মহামারী যে শুধু সাধারণ মুসলমানদেরকেই গ্রাস করেছে তা নয়; বরং কিছু কিছু ইসলামী দলের নেতা, কর্মীদেরকেও গ্রাস করেছে। কারণ এই ইসলামী সংগঠনগুলোর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব স্থানেই রয়েছে দাড়ির প্রতি অনীহা/অবজ্ঞা, আবার অনেক ইসলামী দল আছে যারা কেন্দ্রীয় ঘোষিতভাবে দাড়ির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এই দুই

প্রকার ইসলামী দলের যদি উদাহরণ দেয়া যায় তবে, সর্বপ্রথমেই দাড়ি ছাটা ইসলামী দলের প্রথম কাতারে পড়বে ইসলামী ছাত্র শিবির। যারা দাড়ি রাখার নিজস্ব একটি পদ্ধতিই তৈরি করে নিয়েছে। আর জনগণ সেই দাড়ি নাম রেখে দিয়েছে শিবির কাটিং দাড়ি। (নাউযুবিল্লাহি মিং জালিক)

এটা মূলত জনগণের দোষ না, বরং ছাত্র শিবিরের পরিচালকদের দোষ। আল্লাহ তাদের মাফ করুন (আমীন)। আমি শিবিরকে ব্যক্তিগতভাবে ভালোবাসি, কিন্তু তাদের আমলের বড় ধরনের ঘাটতিও তুলে ধরাটা প্রয়োজন মনে করলাম। আবার অনেক ইসলামী দল আছে, যারা কেন্দ্রীয় ঘোষিত ভাবেই দাড়ির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে তাদের মধ্যে প্রথম কাতারেই রয়েছে তাবলীগ জামায়াত। তাদের শরীরের উপরে রয়েছে সুন্নাতের নিদর্শন, আল্লাহ তাদেরকে এর প্রতিদান হিসেবে উত্তম বিনিময় দান করুন (আমিন)।

তাই আমি মুসলিম যুবক ভাইদেরকে অনুরোধ করব যে, যেই দলই করো না কেন, দাড়ি লম্বা রাখো, টাখনুর উপরে প্যান্ট পরো, ফরজ ছলাত আদায় কর। যদি দেখ তোমার নেতার মুখে কমপক্ষে এক মুষ্টি দাড়ি নাই, কারণ সেই নেতা/নিয়মিত কাচি দিয়ে দাড়ি কেটে শিবির কাটিং দিয়ে দাড়ি রাখে, তবে সেই নেতাকে শেষ সালাম দিয়ে ঐ দল থেকে কেটে পড়ো। কারণ হারাম কাজে কখনোই সফলতা নেই। এই জন্য যে, সেই হারাম কাজটি শয়তান দ্বারা পরিচালিত হয়, আর দাড়ি কেটে ছোট করা বা চাছাও একটি স্পষ্ট হারাম কাজ।

আমি শিবিরের ভাইদের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি আমার কথায় কষ্ট না পেয়ে একটু নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করে দেখুন।

✍ নাভীর নিচের পশম মুন্ডন করাঃ

পাঠক বন্ধু: নাভীর নিচের পশম মুন্ডন করাও একটি স্বভাবজাত সুন্নাত। তাই যথাসময় এই স্বভাবজাত সুন্নাতটি পালন করা প্রতিটি (নারী-পুরুষ) মুসলিমের জন্যই কর্তব্য। সর্বোচ্চ চল্লিশ দিনের মধ্যে তা কাটার জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ

মুসলিমদেরকে সময় বেঁধে দিয়েছেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের জন্য গোঁফ খাটো করা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়িয়ে ফেলা ও নাভীর নিচের পশম মুন্ডন করার জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখা বেঁধে দিয়েছেন, আমরা যেন তা চল্লিশ রাতের বেশি ছেড়ে না রাখি। (মুসলিম হা: ২৫৭)

অতএব সর্বোচ্চ চল্লিশ রাতের মধ্যেই যে কোন একদিন সময় করে নাভীর পশম মুন্ডন করে ফেলতে হবে। আর নাভীর পশম মুন্ডন করা তথা খুর বা ব্লেড দিয়ে চেছে ফেলাই স্বভাবজাত সুন্নাত। তবে তা কোন কেমিক্যাল ব্যবহার করেও তুলে ফেলা যাবে, যদি চাছার যন্ত্র না পাওয়া যায় অথবা চাছা কষ্টকর হয়। কারো জন্য চাছা কষ্টকর হলে, কাচি দিয়ে কেটে ফেলাও অপরাধ নয়।

অতএব যেকোন পদ্ধতিই অবলম্বন করে হোক নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করতে হবে। আর মুসলমানগণ করছেও তাই। কিন্তু এই নাভীর নিচের পশম চাছা নিয়ে সমস্যা রয়েছে অন্য এক জায়গাতে তা হল, বর্তমান অধিকাংশ যুবক ছেলেদেরই জানা নেই নাভীর নিচের পশম কোন পযন্ত চাছতে হবে। ফলে অধিকাংশ যুবক ছেলেকেই দেখা যায়, তারা প্যান্ট হোক আর লুঙ্গি হোক পরিধান করলে পুরুষাঙ্গের ৩/৪ ইঞ্চি উপরে থেকে পরিধান করে। যখন তারা লাজ-লজ্জার বিসর্জন দিয়ে শরীরের পোশাকটি খোলে তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় ইসলাম সম্পর্কে তারা কতটা জ্ঞানহীন, অজ্ঞব্যক্তি।

কারন সেই অবস্থাতে দেখা যায় তাদের নাভীর থেকে শুরু করে প্যান্ট বা লুঙ্গির শুরু পযন্ত পশমে পরিপূর্ণ আর তারা অধিকাংশই সেই পশম প্রদর্শনী করে বেড়ায়। কিন্তু তারা জানেই না, এই পশমগুলো চাছা তাদের জন্য জরুরী। কারণ নাভী থেকে পুরুষাঙ্গ পর্যন্ত এমনকি পায়খানার দ্বারের পশমও নাভীর নিচের পশমের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এটাই হলো পুরুষদের লজ্জাস্থান।

পুরুষের লজ্জাস্থান হচ্ছে নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত। এই স্থানকে গুপ্তস্থানও বলা হয়। মানুষের জন্য সে স্থান গুপ্ত রাখা ওয়াজিব। এমন কি একাকী থাকলেও তার

প্রকাশ করা বা খুলে রাখা উচিত নয়। অনুরূপভাবে অন্য কেউও ঐ স্থানের দিকে চেয়ে দেখা বৈধ নয়। সামনে কেউ না থাকলেও আল্লাহকে লজ্জা করা ঈমানের অন্যতম পরিচয়। তবে স্ত্রীর কাছে থাকলে সে কথা ভিন্ন।

আর এই লজ্জাস্থান বা গুপ্তস্থানের পশম মুন্ডন করা তথা নাভী থেকে শুরু করে পুরুষাঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ পর্যন্ত যথা সময়ে পরিষ্কার করা মুসলিমদের জন্য জরুরী। যদি কেউ বিশেষ করে কোন মুসলিম পুরুষ যদি শুধু পুরুষাঙ্গর আশ-পাশেরই কিছু সামান্য পশম চাছে, তবে তার দ্বারা স্বভাবজাত সুন্নাত আদায় হবেনা, নাভীর নিচের অংশের পশমও চাছতে হবে।

✍ বগলের পশম উপড়িয়ে ফেলাঃ

পাঠক বন্ধুঃ বগলের পরিচ্ছন্নতার সম্পর্কেও ইসলাম মানুষকে সচেতন করেছে। বগলের গন্ধে যেন অন্য কেউ কষ্ট না পায় সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত প্রত্যেক মুসলিমের। যেমনঃ বগলের পশম ছিড়ে বা তুলে ফেলা একটি স্বভাবজাত সুন্নাত। এই সুন্নাতটিও পালন করা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্যই কর্তব্য। জানা প্রয়োজন যে বগলের পশম ছিড়ে ফেলা বা তুলে ফেলা সুন্নাত। তবে তা কষ্টকর হলে চেছে ফেলা বা কেমিক্যাল ব্যবহার করে পরিষ্কার করে ফেলা বৈধ। (কাশশাফুল ক্বিনা ১/৯৫)

ব্যক্তির বাহ্যিক আমল ফিতরাত বা স্বভাবজাত সম্পর্কে আলোচনার পর দ্বিতীয় বিষয় নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো-

✍ লেবাসের প্রতি সচেতন হওয়াঃ

পাঠক বন্ধঃ মুসলিমদের জন্য পোশাক পরিধানেও অত্যন্ত সচেতন হওয়া প্রয়োজন। অনেকেই পোশাককে খুবই তুচ্ছভাবে দেখে অথচ ইসলাম পোশাকের প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছে। তাই ইসলামের নির্দেশনা মেনে পোশাক পরিধান করাও

ইসলাম পালনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আমি ইসলাম নির্দেশিত পোশাক সম্পর্কে নিচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম।

✍ রং এর মধ্যে হলুদ বা জাফরানী রং ব্যবহার পুরুষের জন্য নিষিদ্ধঃ

পাঠক বন্ধু! মুসলিম পুরুষদের জন্য গাঢ় হলুদ বা জাফরাণী রঙের লেবাস পরিধান করা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। হযরত আমর বিন আস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একদা আমার গায়ে দুটি জাফরাণী রঙের কাপড় দেখে বললেন, এগুলো কাফেরদের কাপড়। সুতরাং তুমি তা পড়ো না। (মুসলিম; মিশকাত হাঃ ৪৩২৭)

অতএব জাফরান তথা গাঢ় হলুদ রঙের লেবাস মুসলিম পুরুষদের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। তবে কালো, সবুজ, লাল-কালো মিশ্রিত কিংবা এ জাতীয় যেকোন রঙের লেবাসই পরিধান করা যাবে। শুধু গাঢ় হলুদ রঙের পোশাক ব্যতীত। আবার একেবারেই লাল পোশাক পরিধান করা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম আয যাওযী (রহিঃ) বলেন, অনেকে এ ধরনের ভুল ধারনা করে থাকে যে, আল্লাহর রসূল ﷺ একেবারেই লাল পোশাক পরিধান করতেন এবং তাতে অন্য কোন রঙের সংমিশ্রণ ছিল না। বিষয়টি এমন নয় বরং তিনি যে লাল রঙের একসেট পোশাক পরিধান করতেন, সেটি প্রস্তুত করা হয়েছে ইয়ামানী চাদর দ্বারা, যে চাদর দুটিতে লাল ও কালো রংয়ের রেখা ছিল। চাদরটি ছিল ঠিক অন্যান্য ইয়ামানী চাদরের মত। তবে চাদরের লাল রেখার কারনে চাদরটি এ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। অন্যথায় লাল রংয়ের কাপড় পরিধান করা তো গোনাহের কাজ। (যাদুল মা'আদ, অনুবাদকঃ হাফিয মুফতি মোবারক সালমান, পৃঃ ৭৩)

তিনি আরো বলেন, সুনানের কয়েকটি কিতাবে এসেছে যে, সাহাবাগণ রসূল ﷺ এর সঙ্গে এক সফরে ছিল। তখন রসূল ﷺ তাদের সাওয়ারীর উপর লাল রংয়ের ডোরাকাটা আরেকটি চাদর দেখতে পেয়ে বললেন, সাবধান আমার মনে হয় এ লাল রং তোমাদের মাঝে প্রাধান্য লাভ করেছে। একথা শোনামাত্র সম্মানার্থে আমরা দাড়িয়ে গেলাম, এমন কি আমাদের অনেক উটগুলো পালাতে শুরু করল। অত:পর আমরা চাদরগুলোকে নিয়ে ছিড়ে ফেললাম। (যাদুল মা'আদ, অনুবাদক- হাফিয মুফতি মোবারক সালমান, পৃঃ ৭৩)

রংয়ের মধ্যে সাদা রংয়ের লেবাস আল্লাহর রসূল ﷺ পছন্দ করতেন। সাদা রঙের কাপড় পরিধান করা সবচেয়ে উত্তম। হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম (রহিঃ) বলেন, নবী ﷺ এর সবচেয়ে প্রিয় রং ছিল সাদা। (যাদুল মা'আদ, পৃ:৭৪)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের সাদা রংয়ের কাপড় পরিধান কর। কেননা, তা তোমাদের সর্বোত্তম কাপড় আর ওতেই তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে কাফন দাও। (রিয়াদুছ ছলীহিন ১/৭৮৩; আবু দাউদ হা: ৩৮৭৮; তিরমিযী হা: ১৭৫৭)

হযরত সামুরাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা সাদা রঙের কাপড় পরিধান কর, কেননা, তা সবচেয়ে পবিত্র ও উৎকৃষ্ট। আর ওতেই তোমাদের মৃতদেরকে কাফন দাও। (রিয়াদূছ ছলিহীন ১/৭৮৪; সহিহ তারগীব হাঃ ২০২৭)

✍ রেশমী কাপড় পরিধান করা পুরুষদের জন্য অবৈধঃ

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে দেখেছি, তিনি ডান হাতে রেশম ধরলেন এবং বাম হাতে সোনা, অত:পর বললেন, আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য এ দুটি বস্তু হারাম। (রিয়াদুছ ছলিহীন ৪/৮১১; আবু দাউদ হাঃ ৪০৫৭)

তবে কোন ব্যক্তির শরীরে চুলকানি রোগ থাকলে রেশমী কাপড় পরিধান করতে পারবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যুবাইর ও আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) কে, তাদের গায়ে চুলকানি হবার দরুন রেশমী কাপড় পরিধান করার অনুমতি দিয়েছিলেন। (রিয়াদুছ ছলিহীন ১/৮১৪; ছহিহ বুখারী হাঃ ৫৮৩৯, ২৯১৯, ২৯২০)

আল্লাহর রসূল ﷺ এর পছন্দের পোশাকঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ এর সবচেয়ে বেশি পছন্দনায় পোশাক ছিল কামীজ (ফুল হাতা, প্রায় টাকনুর উপর পর্যন্ত লম্বা জামা বিশেষ)। হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় পোশাক ছিল কামীজ (জামা)। (রিয়াদুছ ছলিহীন ১/৭৯৩; আবু দাউদ হাঃ ৪০২৫, ৪০২৬; তিরমিযী হাঃ ১৭৬২)

জানা প্রয়োজনঃ

হাদিছে উল্লেখিত কামীজ বা জামাকেই আমরা জুব্বা বলে থাকি।

✍ মূল্যবান পোশাক পরিধান ত্যাগ করার গুরুত্বঃ

পাঠক বন্ধুঃ মূল্যবান পোশাক পরিধান করা বর্তমানে মানুষের অহংকার ও বড়ত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রেই অধিকাংশ ব্যবহৃত হচ্ছে। আমি সাধারণ মুসলমানদের বিষয়ে বলবো না। বিশেষ করে, এদেশের আলেম-উলামাদের উদ্দেশ্যেই বলবো- অনেক সময় আলেমদের মাঝে এই বিষয়টিই অনেক দেখা যায় যে, একটু দামী পোশাক পড়লেই বড় আলেম মনে হবে। আর সমাজে প্রায় এমনটিই হয়ে উঠেছে। দামী জুব্বা, দামী টুপি, দামী আতর, ব্যবহার করলেই যেন সে বড় আলেম হয়ে যায়, অথচ তার ভিতরে যদিও শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে ঠিকই কিন্তু আমল নাই। এই সকল আলেমরাই বর্তমানে দেশে (সেলিব্রিটি) আলেম হয়ে বসে আছেন। তবে একটি বিষয় হল, তারা শুধু একট্‌ মূল্যবান পোশাক পরিধান করেই যে সেলিব্রিটি হয়েছে তা নয় বরং জনগণকে আকর্ষণ করার কিছু মসলাপাতিও তাদের কাছে

রয়েছে। যেমন ধরুন মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা ওয়াজ। যদিও সে বাস্তবে মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার ধারে কাছেও নেই। ওয়াজের মাঝে মাঝে জিহাদী গর্জন, নিজের যোগ্যতা মানুষের নিকট জাহির করার জন্য, বিদেশ ভ্রমণের গল্প ইত্যাদি। আর জনগণ তাদের ঐ হুংকার, গর্জন আর মুসলিম ঐক্যবদ্ধকরনের গল্প, পাশাপাশি বিদেশ সফরের গল্প শুনে তাদের দিকেই ধাবিত হয় বেশি। জনগণ তাদের বাস্তব আমলের কোন চিন্তা রাখে না। ফলে ঐ সকল আলেমই সমাজে হয়ে উঠেছে সেলিব্রিটি।

এই সকল সেলিব্রিটি আলেমদের আরও কিছু গুণ রয়েছে, যেমন যেখানে যে মতবাদের জনশক্তি বেশি, সেখানে সেই মতবাদের পক্ষ নিয়েই ওয়াজ করে। রাজশাহীর একটি ঘটনাবলি- ২০২২ ঈসায়ী সালে কারাগারে কোন এক সেলে, যেখানে সন্ত্রাস বিরোধী মামলার আসামী থাকে, সেখানে একদিন শাইখ হারুন ইজাহার (হাফিজাহুল্লাহ) তাদের কিছুজনকে নিয়ে কুরআন ও হাদিসের আলোচনা করছে। তার আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল- ১৬ই ডিসেম্বরসহ জাতীয় বা আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ আছে, তা পালনে ইসলামের নির্দেশনা কি?

পাঠক বন্ধু! ঐ আলোচনা শেষে নাটোরের এক ভাইসহ কয়েকজন ভাই গল্পের এক প্রসঙ্গে ঐ আলোচনা ও তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমাকে অবগত করেন।

আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, সঠিক বিবেচনা করে দেখেন তো, এই জায়গাতে কি, এই বিষয়ে কোন আলোচনার প্রয়োজন আছে? তারা বলে না, প্রয়োজন নেই, কারণ এখানে যারা রয়েছে তারা সকলেই জানে এই সকল দিবস পালনে ইসলামের নির্দেশনা কি? কারণ এখানকার সকলেই ইসলাম সম্পর্কে কমবেশ জ্ঞান রাখে।

এখানে আলোচনার যা বিষয়বস্তু হবার কথা ছিলো তা হলো এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে ছোট করে দেখা যাবে না, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যাবে না, গীবত করা যাবে না, মতাদর্শ্যে না মিললে একজন আরেকজনকে কাফের বলা যাবে না,

অন্যদলের সদস্যদেরকে (তাদের সদস্য সংখ্যা কম থাকার কারনে) অবরুদ্ধ বা কোণঠাসা করা যাবে না, ইত্যাদি সমস্যা রয়েছে। কিন্তু তিনি ঐ সকল কোন বিষয় নিয়েই আলোচনা না করে, সবাই যেখানে একমত সেই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করেছে যে, সবাই আলোচকের উপর খুশি থাকেন, তাহলে যারা ভুল করে গীবত করছে, অন্য মুসলমানকে কাফের বলছে, সংখ্যায় কম যদি থাকে ভিন্ন মতাদর্শের মুসলমান, তাদেরকে কোণঠাসা করে রাখছে- এই ভুলকারীরা, উক্ত আলোচনা শুনে সংশোধন হবে কিভাবে? এটাই হল সেলিব্রিটি আলেমদের অবস্থা।

কেউ যদি কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করে, তবে এই সকল সেলিব্রেটি আলেমরা আগে দেখে কোন পক্ষের জনশক্তি ঐ স্থানে বেশি। অবস্থা বুঝে মাসআলা দেয়, সেই মাসআলা শুনে সংশোধন হওয়া তো দূরের কথা বরং সমাজে বিশৃঙ্খলা বাড়বে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকেই হেফাজত করুন, এমন সেলিব্রেটি আলেমদের কাছ থেকে মাসআলা নেওয়া হতে 'আমীন'।

পাঠক বন্ধু: ম্ল্যবান পোশাক পরিধান করা ত্যাগের আলোচনা প্রসঙ্গেই উপরের আলোচনাটি এসেছে, যা বর্তমানের একশ্রেণীর আলেমদের সাথে হুবহু মিলে যায়। কাজেই আমি ঐ সকল আলেমদের নিকটেই বিশেষভাবে অনুরোধ রাখব তারা যেন মূল্যবান পোশাক পরিধান করে নিজেদেরকে বড় আলেম হিসেবে পরিচয় দিতে না চান, কারণ তাতে আলেম, জাহেল উভয়ের ক্ষতি।

তাছাড়াও ঐ সকল মুল্যবান পোশাক পরিধান ত্যাগ করার ব্যাপারে ইসলামের ভূমিকা হল, হযরত মুয়াজ ইবনে আনাস আল জুহানী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি মূল্যবান পোশাক পড়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিনয়বশত: তা পরিহার করল, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের সাক্ষাতে তাকে ডেকে স্বাধীনতা দেবেন, যেন ঈমানের (অর্থাৎ ঈমানদারদের পোশাক) জোড়াসমূহের মধ্যে থেকে, যে কোন জোড়া বেছে নিয়ে পরিধান করে। (রিয়াদুছ ছলিহীন ১/৮০৬; তিরমিযী হা: ২৪৮১)

কাজেই পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে মূল্যবান পোশাক ত্যাগ করাই উত্তম এবং যার সামর্থ্য আছে সে যেন একেবারেই নোংড়া, ছেড়া-ফাটা পোশাক পরিধান না করেন।

অতএব মধ্যম ধরনের পোশাক পরিধান করা উত্তম। অকারণে সঠিক উদ্দেশ্য ব্যতীত নোংড়া, ছেড়া-ফাটা পোশাক পরিধান করা অনুচিত। কারণ তাতে উপহাস হতে পারে। হযরত আমর ইবনে শুয়াইব স্বীয় পিতা হতে, তিনি স্বীয় দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন- "নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তার বান্দার উপর তার প্রদত্ত নেয়ামতের প্রভাব ও চিহ্ন দেখা যাক।" (রিয়াদুছ ছলিহীন ১/৮০৭; তিরমিযী হাঃ ২৮১৯)

✍ মুসলিমের প্যান্ট, পায়জামা, লুঙ্গি টাখনুর নিচ পর্যন্ত পরিধান করা বৈধ নয়ঃ

পাঠক বন্ধুঃ বেপরোয়া মানুষদের কয়েকটি স্বভাবের মধ্যে প্যান্ট বা লুঙ্গি ঝুলিয়ে পড়া। যা মুসলিম পুরুষদের জন্য বৈধ নয়। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, মুসলিমের লুঙ্গি অর্ধ গোছা পযন্ত (অর্থ্যাৎ হাটু ও টাখনুর মধ্যবর্তী স্থান) ঝুলানো উচিত। টাখনুর উপর পর্যন্ত ঝুললে ক্ষতি নেই। যে অংশ লুঙ্গি পায়ের টাখনুর নিচে ঝুলবে, তা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। অহংকার বশতঃ যে ব্যক্তি পায়ের টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে লুঙ্গি পড়বে, তার দিকে আল্লাহ (করুণার দৃষ্টিতে) তাকিয়ে দেখবেন না। (রিয়াদুছ ছলিহীন ১০/৮০৩; আবু দাউদ হাঃ ৪০৯৩; ইবনু মাজাহ হাঃ ৩৫৭০)

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন- অহংকার বশতঃ যে ব্যক্তি টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পড়বে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে (করুণার দৃষ্টিতে) দেখবেন না। "উম্মে সালামাহ প্রশ্ন করলেন, তাহলে মহিলারা তাদের কাপড়ের নিচের অংশের ব্যাপারে কি করবেন? তিনি বলেন, আধহাত বেশি ঝুলাবে। উম্মে সালামাহ বলেন তাহলে তো তাদের পায়ের পাতা খোলা

যাবে। তিনি বলেন, একহাত পযন্ত নিচে ঝোলাবে: তার বেশি নয়। (রিয়াদুছ ছলিহীন ১২/৮০৫)

অতএব পুরুষদের জন্য টাখনুর উপরে লুঙ্গি, প্যান্ট, পায়জামা পড়তে হবে। আর নারীদের জন্য শুধু টাখনু নয় বরং পায়ের পাতা থেকেও আধহাত নিচের দিকে ঝুলিয়ে পড়তে হবে। এটাই ইসলামের নির্দেশনা।

✍ ইসলামে পানাহারের নির্দেশনা:

পাঠক বন্ধু! পানাহারের প্রথম শর্ত হল হালাল ও পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ করা, আর হারাম ও অপবিত্র খাদ্য বর্জন করা। হালাল খাদ্য ভক্ষণের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ, মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

অর্থ: "হে মানবজাতি: পৃথিবীতে যাহা কিছু হালাল ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রহিয়াছে তাহা হইতে তোমরা আহার কর।" (সূরাহ বাকারাহ, আ: ১৬৮)

অতএব মানুষ যা ভক্ষণ করবে, অবশ্যই তা হালাল হতে হবে। তা ব্যতীত হারাম খাদ্য ভক্ষণ করে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। আল্লাহর রসূল ﷺ একদা কা'ব বিন ওজারার উদ্দেশ্যে বললেন, "হে কা'ব বিন উজারাহ! সে গোস্ত কোনো দিন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার পুষ্টি সাধন হারাম খাদ্য দ্বারা করা হয়েছে (দারেমী হা: ২৭৭৬)। আল্লাহর রসূল ﷺ আরো বলেন, হে কাব বিন উজরাহ! যে গোস্ত হারাম খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত হবে, তার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত (ছহিহ তিরমিযী হা: ৬১৪)।

সুতরাং আমাদের সকল মুসলমানকেই হারাম পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে। তা ব্যাতীত হারাম খাদ্যে গঠিত আমাদের এই প্রিয় দেহটি জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে, যা অসহনীয় শাস্তি। কাজেই অবশ্যই আমাদের সকলকেই হারাম ও হালাল খাবার সম্পর্কে অবগত হতে হবে।

✍ কুরআনে বর্ণিত হারাম খাদ্যঃ

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَ مَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهٖ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوْذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَ مَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۟ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ اَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ؕ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ؕ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ ؕ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳﴾

অর্থ: "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃতজন্তু, রক্ত, শূকর-মাংস, আল্লাহ ব্যতীত অপরের নামে যবেহকৃত পশু, আর শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, আঘাতে মৃত জন্তু, উপর থেকে পড়ে মৃত জন্তু, শিংয়ের আঘাতে মৃত জন্তু, এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু, তবে যাহা তোমরা যবেহ করিতে পারিয়াছ তাহা ব্যতীত। আর যাহা মূর্তি পূজার দেবীর উপর বলি দেওয়া হয় তাহা এবং লটারি কিংবা জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা এইসব পাপকাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীনের বিরুদ্ধাচারণে হতাশ হইয়াছে; সুতরাং তাহাদেরকে ভয় করিও না, শুধু আমাকে ভয় কর।" (সূরাহ মায়িদা, আ: ৩)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শাফী (রহিঃ) বলেন- আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে তোমাদের জন্য মৃত জন্তু হারাম করা হয়েছে।

প্রথম- "মৃত" বলে ঐ জন্তু বোঝানো হয়েছে, যা যবেহ ব্যতীত কোন রোগ বা স্বাভাবিকভাবে মরে যায়। এ ধরনের মৃত জন্তুর গোস্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং আধ্যাত্বিক দিক দিয়েও। তবে হাদিসে আল্লাহর রসূল ﷺ দুই প্রকার মৃতকে বিধানের বাইরে রেখেছেন। একটি মৃত মাছ ও অপরটি মৃত টিড্ডি (পতঙ্গ বা পংগোপাল)। (মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ, দারেকুতনি, বায়হাকী)

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত **দ্বিতীয়**- হারাম বস্তু হচ্ছে রক্ত। কুরআনের অন্য আয়াতে আওদামাম মাছফূহা বলায় বোঝা যায়, যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাই হারাম।

সুতরাং কলিজা ও প্লীহা রক্ত হওয়া সত্ত্বেও হারাম নয়। পূর্বোক্ত যে, হাদিসে মাছ ও টিড্ডীর কথা বলা হয়েছে, তাতেই কলিজা ও প্লীহা হালাল হওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

তৃতীয় বস্তু- শূকরের মাংস। একেও হারাম করা হয়েছে। গোস্ত বলে তার সম্পূর্ণ দেহ বুঝানো হয়েছে, চর্বি ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ- ঐ জন্তু যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। যদি জবেহ করার সময়ও অন্যের নামে নেওয়া হয়, তবে তা খোলাখুলি শিরক। এরূপ বস্তু সর্বসম্মতিভাবে মৃতের অন্তর্ভুক্ত। যেমনঃ আরবের মুশরিকরা মূর্তিদের নামে জবেহ করতো।

বর্তমানেও কোন কোন মূর্খ লোক পীর-ফকীরের নামে জবেহ করে। যদিও জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে; কিন্তু জন্তুটি যেহেতু অন্যের নামে উৎসর্গকৃত এবং তার সন্তুষ্টির জন্যে কুরবানী করেন, তাই সাধারণ ফেকাহবিদগণ একেও- "ওয়া মা-উহিল্লা লি গইরিল্লাহি বিহী" আয়াত দৃষ্টে হারাম বলেছেন। **পঞ্চম-** ওয়াল মুনখনিক্বোতু-অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম যাকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে অথবা নিজেই কোন জাল ইত্যাদিতে আবদ্ধ অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে গেছে।

ষষ্ঠ- "মাও কূজাতু" অর্থাৎ-ঐ জন্তু হারাম, যা লাঠি অথবা পাথর ইত্যাদির আঘাতে নিহত হয়। যদি নিক্ষিপ্ত তীরের ধারালো অংশ শিকারের গায় না লাগে এবং তীরের আঘাতে শিকারে নিহত হয়, তবে সেই শিকারও "মাও কূজাতু" এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। "মুনখনিক্বতু এবং মাইতাতু" উভয়টি মাও কূজাতু তথা মৃতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জাহিলিয়াত যুগে এগুলোকে জায়েজ মনে করা হতো। একারণে আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) একবার আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাস করলেন, আমি মাঝে মাঝে চওড়া তীর দ্বারা শিকার করি। যদি এতে শিকার মরে যায়, তবে খেতে পারি কি না?

তিনি উত্তরে বললেন, তীরের যে অংশের আঘাতে শিকার মরে যায়, তবে তা "মাওকূজাতু" এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তুমি খেতে পারবে না। আর যদি ধারাল অংশ শিকারের গায়ে লাগে এবং শিকারকে আহত করে, তবে তা খেতে পার। ইমাম জাসসাস "আহকামুল-কোরআন" গ্রন্থে এ হাদিসটি নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন, এরূপ শিকার হালাল হওয়ার জন্যে শর্ত এই যে, "বিসমিল্লাহ" বলে তীর নিক্ষেপ করতে হবে। যে শিকার বন্দুকের গুলিতে মরে যায়, বিদ্বানগণ সেটাকেও "মাওকূজাতু" এর অন্তর্ভুক্ত করে হারাম বলেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলতেন, বন্দুক দ্বারা যে জন্তকে হত্যা করা হয় তাই "মাওকূজাতু) অর্থাৎ হারাম। (জাসসাস)

ইমাম আবূ হানিফা, শাফেয়ী, মালেক (রহিঃ) প্রমুখ সবাই এ ব্যাপারে একমত। (কুরতুবী)

সপ্তম- "মুতারদ্দি ইয়াতু" অর্থ্যৎ ঐ জন্তু হারাম, যা কোন পাহাড়, টিলা, উঁচু দালানের উপর থেকে অথবা কুপে পড়ে মরে যায়। একারণেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যদি তুমি পাহাড়ের উপর দন্ডায়মান কোন শিকারের প্রতি "বিসমিল্লাহ" বলে তীর নিক্ষেপ কর এবং তীরের আঘাতে সে নীচে পড়ে মরে যায়, তবে তা খেয়ো না কারণ এতে সম্ভাবনা আছে যে, শিকারটি তীরের আঘাতে না মরে, নীচে পড়ে যাওয়ার কারণে মরে গেছে। এমতাবস্থায় তা মুতারদ্দি ইয়াতু এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে কোন পাখিকে তীর নিক্ষেপ করারপর যদি সেটি পানিতে পড়ে মারা যায়, তবে উহা খাওয়া নিষিদ্ধ। কারণ, এখানেও পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (জাসসাস)

অষ্টম- "নাত্বীহাতু" অর্থ্যৎ ঐ জন্তু হারাম, যা কোন সংঘর্ষে নিহত হয়। যেমনঃ রেল গাড়ী, মটর ইত্যাদির নীচে এসে মরে যায় অথবা কোন জন্তুর শিং এর আঘাতে মরে যায়।

নবম- ঐ জন্তু হারাম, যেটি কোন হিংস্র জন্তুর কামড়ে মরে যায়। উপরোক্ত নয় প্রকার হারাম জন্তুর বর্ণনা করার পর একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করে বলা হয়েছে জাক্কাইতুম অর্থ্যৎ এসব জন্তুর মধ্যে কোনটিকে জীবিত অবস্থায় পাওয়ার পর জবেহ করতে পারলে হালাল হয়ে যাবে। এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চার প্রকার জন্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে না। কেননা, মৃত রক্তকে জবেহ করার সম্ভাবনা নাই, শূকর এবং আল্লাহ ব্যতিত অন্যের নামে উৎসর্গকৃত জন্তু সত্তার দিক দিয়েই হারাম। এ দুটোকে জবেহ করা, না করা উভয়ই সমান। এ কারণে হযরত আলী (রাঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান বসরী (রহিঃ), কাতাদাহ (রহিঃ) প্রমূখ পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ বিষয়ে একমত যে, এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চারটি নয়; বরং পরবর্তী পাঁচটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। অতএব আয়াতের অর্থ এই দাড়ায় যে, এ পাঁচ প্রকার জন্‍র মধ্যে যদি তদবস্থায়ই “বিসমিল্লাহ” বলে জবেহ করে দেয়া হয়, তবে এগুলো খাওয়া হালাল হবে।

দশম- ঐ জন্তু হারাম, যাকে নুছুরের উপর জবেহ করা হয়। নছুর ঐ প্রস্তরকে বলা হয়, যা কাবাগৃহের আশে-পাশে স্থাপিত ছিল। জাহিলিয়াত যুগে আরবরা এদের উদ্দেশ্যে জন্তু কোরবানী করত। এ কে তারা ইবাদত বলে গণ্য করত। জাহিলিয়াত যুগের আরবরা উপরোক্ত সব প্রকার জন্তুর গোস্ত ভক্ষণে অভ্যস্ত ছিল। কুরআন মাজিদ এগুলোকে হারাম করেছে।

একাদশ- হারাম যা ‘আংতাহ তাক্বছিমূ বিল আয লা-ম’ শব্দটির এর বহুবচন। এর অর্থ তীর, যা জাহিলিয়াত যুগে ভাগ্য পরিক্ষার জন্য নির্ধারিত ছিল। এ কাজের জন্য ৭টি তীর নির্ধারিত ছিল। তন্মধ্যে একটিতে ‘নাআ’ম’ অর্থ (হ্যাঁ) একটিতে ‘লা’ অর্থ (না) এবং অন্য গুলোতে অন্য শব্দ লিখিত ছিল। এ তীরগুলো কাবাগৃহের খাদেমের কাছে থাকতো। কেউ নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে অথবা কোন কাজ করার পূর্বে তা উপকারী হবে না, অপকারী হবে তা জানতে চাইলে সে কাবার খাদেমের কাছে পৌছে একশত মুদ্রা উপঢৌকন দিত। খাদেম তুন থেকে একটি একটি করে তীর বের করত। হ্যাঁ শব্দ বিশিষ্ট তার বের হয়ে

আসলে মনে করা হতো যে, কাজটি উপকারী, পক্ষান্তরে না শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হলে তারা বুঝে নিত যে, কাজটি করা ঠিক হবে না।

হারাম জন্তু সমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারা এই তীর গুলো জন্তুসমূহের মাংস বন্টনেও ব্যবহার করত। কয়েক জন শরীক হয়ে উট ইত্যাদি জবেহ করে তা গোস্ত প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী বন্টন না করে, এ সব জুয়ার তীরের সাহায্যে বন্টন করত। ফলে কেউ সম্পূর্ণ বঞ্চিত, কেউ প্রাপ্য অংশের চাইতে কম, এবং কেউ অনেক বেশী গোস্ত পেয়ে যেত। এ কারণে হারাম জন্তুর বর্ণনা প্রসঙ্গে এ হারাম বন্টন পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে।

আলেমগণ বলেন, ভবিষ্যৎ অবস্থা এবং অদৃশ্য বিষয় জানার যেসব পন্থা প্রচলিত আছে সব 'আংতাছ তাক্বছিমূ বিল আযলা-ম' এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম (তথা- মানুষের ভবিষৎ বলে অর্থ উপার্জন করা, লটারীতে অর্থ উপার্জন করাও এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম)। (তাফসিরে মা'রিফুল কুরআন, পৃ: ৩০৭-৩০৯)

✍ কুরআনে বর্ণিত হালাল খাদ্য:

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۴﴾

অর্থ: "লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাহাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে? বল, সমস্ত জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং শিকারী পশু-পাখী যাদেরকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছ, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়াছেন। উহারা যাহা তোমাদের জন্য ধরিয়া আনে তাহা ভক্ষণ করিবে এবং ইহাতে আল্লাহর নাম নিবে আর আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।" (সূরাহ মায়িদা, আ: ৪)

অতএব উপরোক্ত উল্লেখিত ১১ শ্রেণীর খাদ্য ভক্ষণ করা স্পষ্ট হারাম। ১১ শ্রেণীর খাদ্য ব্যতীত সমস্ত পবিত্র খাদ্যই মুসলমানদের জন্য হালাল। তবে আরো যেই সকল খাদ্য ও পানীয়কে আল্লাহ তা'য়ালা হারাম ঘোষনা করেছেন সেগুলো অবশ্যই হারাম। যেমনঃ মদ, সুদের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ ইত্যাদি। এই সকল স্পষ্ট হারাম খাদ্য ও পানীয় ব্যতীত পবিত্র সকল খাদ্য ও পানীয় মুসলমানদের জন্য হালাল।

পাঠক বন্ধু! উপরে উল্লেখিত আয়াতে শিকারী পশু-পাখি যা তার মনিবের জন্য ধরে আনবে, যদি তা জীবিত থাকে তবে সেই গুলো হালাল বলে ঘোষনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিদ্বানগণ বলেন, শিকারী কুকুর, বাজপাখি ইত্যাদি দ্বারা শিকার করা জন্তু হালাল হওয়ার জন্যে চারটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

ক) কুকুর অথবা বাজপাখি শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে হবে। শিকার পদ্ধতি এই যে, আপনি যখন কুকুরকে শিকারের দিকে প্রেরণ করবেন, তখন সে শিকার ধরে আপনার কাছে নিয়ে আসবে, নিজে খাওয়া শুরু করবে না। বাজপাখির বেলায় পদ্ধতি এই যে, আপনি ফেরত আসার জন্য ডাক দেয়া মাত্রই সে কাল বিলম্ব না করে ফিরে আসবে। যদিও তখন কোন শিকারের পিছনে ধাওয়া করতে থাকে। শিকারী জন্তু এমন ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে গেলে বোঝা যাবে যে, সে আপনার জন্য শিকার করে, নিজের জন্য নয়। এমতবস্থায় এগুলো ধরে আনা শিকার স্বয়ং আপনারই শিকার বলে গণ্য হবে। যদি শিকারী জন্তু কোন সময় এ শিক্ষার বিরুদ্ধাচারণ করে যেমন- কুকুর নিজেই খাওয়া আরম্ভ করে কিংবা বাজপাখি আপনার ডাকে ফেরত না আসে, তবে এ শিকার আপনার শিকার নয়। কাজেই তা খাওয়া বৈধ্য নয়।

খ) আপনি নিজ ইচ্ছায় কুকুরকে অথবা বাজপাখিকে শিকারের পেছনে প্রেরণ করবেন। কুকুর অথবা বাজপাখি যেন স্বেচ্ছায় শিকারের পেছনে দৌড়ে শিকার না করে। আলোচ্য আয়াতে এ শর্তটি (মুকাল্লিবীনা) শব্দে বর্ণিত হয়েছে।

গ) শিকারী জন্তু নিজে শিকারকে খাবে না; বরং আপনার কাছে নিয়ে আসবে। এ শর্তটি (মিমমা-আমছাকনা আলাইকুম) বাক্যাংশে বর্ণিত হয়েছে।

ঘ) শিকারী কুকুর অথবা বাজপাখিকে শিকারের দিকে প্রেরণ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে। অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿۱﴾

অর্থ: "হে মু'মিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে। যাহা তোমাদের নিকট বর্ণিত হইতেছে, তাহা ব্যতীত চতুষ্পদ আ'নআম (তথা-উট, গরু, মেষ, ছাগল এবং অন্যান্য অহিংস্র ও রোমন্থনকারী জন্তু যথা- হরিণ, নীল গাই, মহিষ ইত্যাদি কিন্তু ঘোড়া, গাধা ব্যতীত) তোমাদের জন্য হালাল করা হইলো।" (সূরাহ মায়িদা, আ: ১)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন-

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۹۶﴾

অর্থ: "তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও উহা ভক্ষণ হালাল করা হইয়াছে, তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য। তোমরা যতক্ষণ ইহরাম থাকিবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম।" (সূরাহ মায়িদা, আয়াত: ৯৬)

অতএব হালাল ও হারাম দু'টই মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের জন্য স্পষ্ট করেছেন। স্পষ্ট হারাম ব্যতীত যত পবিত্র খাদ্য ও পানীয় আছে সবই আমাদের জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা হালাল করেছেন। কাজেই অবশ্যই আমাদেরকে সেই হারামগুলো বর্জন করতে হবে- যা আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের জন্য হারাম করেছেন। তবে হালাল ও হারাম এই দুয়ের মাঝেও সন্দেহ জনক কিছু রয়েছে। আর সেইগুলোর মধ্যে যেইগুলো উত্তম তথা পবিত্র সেইগুলো বান্দা তার প্রয়োজনে এবং শখ বশবর্তী হয়েও খাদ্য ও পানীয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে। কারণ এটা তার জন্য হারাম নয়। তবে আরো কিছু জিনিস আছে যা পবিত্রও নয়,

বরং ক্ষতিকর, অথচ সেই জিনিসগুলো মানুষ খায় এবং পান করে। যেমন: তামাকদ্রব্য, ধুমপান। অনেকেই বলে থাকেন, তামাকদ্রব্য ধুমপান মাকরূহ। তবে বিশুদ্ধ মতে তা হারাম।

সেই বিষয়ে নিম্নে আলোচনা উল্লেখ করা হলো।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত খাদ্যদ্রব্যকে ২ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা:

১. হালাল ২. হারাম

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿...﴾

অর্থ: "যে তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন ও অপবিত্র বস্তু হারাম করেছেন।" (সূরাহ আ'রফ, আ: ১৫৭)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন-

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَ الطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿...﴾

অর্থ: " বল, পবিত্র ও অপবিত্র এক নয়।..." (সূরাহ মায়িদা, আ: ১০০)

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিস- হযরত নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট. আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহ জনক কিছু বস্তু। (ছহিহ বুখারী হা: ২৯২৩; মুসলিম হা: ১৫৯৯; মুসনাদে আহমাদ হা: ১৮৩৯৬, ১৮৪০২)

অন্য এক হাদিছে নবী ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি সন্দেহ জনক বিষয়ে পতিত হল, সে যেন হারামেই পতিত হল। (আবূ দাউদ হা: ৩৩০০; ইবনে মাজাহ হা: ৩৯৪৮) উল্লেখিত কুরআন এবং হাদীসের দলিল দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে,

ইসলামে মাকরুহ বলতে কোন বিধান নেই। যা রয়েছে হারাম ও হালাল। সুতরাং বিড়ি, সিগারেট, তামাক, জর্দা হালাল নয়। কুরআন এবং সুন্নাহের আলোচনা প্রমাণ করে এ সকল বস্তুসমূহ হারাম। এ প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন- "যাবতীয় নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম।" (মুসলিম ২/১৬৭; ইবনে মাজাহ হা: ৩৩৯০) উল্লেখ্য যে, যে সকল লোক এবং আলেম এ সকল বস্তু মাকরুহ বলে, খোঁজ নিয়ে দেখেন যে, ঐ সকল লোক বা আলেমগণ তাহা ভক্ষণকারী। অতএব কোন লোকের কথা মান্য করা যাবে না, আল্লাহ ও রসূল ছাড়া।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

অর্থ: "অতএব যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, তাহলে সেই বিষয়কে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।" সূরাহ নিছা, আ: ৫৯)

অতএব প্রমাণিত হয় যে, তামাকদ্রব্য মাকরুহ নয় বরং হারাম।

✍ মাকরুহ কি?

পাঠক বন্ধু! কম বেশি আমাদের সকলেরই নিকট ইসলামের বিধান নামে একটি শব্দ ব্যপক ভাবে পরিচিত তা'হলো 'মাকরুহ'। একই সাথে এটাও জানা আছে যে, মাকরুহ হলো ইসলামের এমন একটি বিধান যা সংঘটিত হলে নেকী ও গুনাহ নেই।

এই 'মাকরুহ' বিধানটি নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। এক শ্রেণীর বিদ্বানগণ বলেন, ইসলামে মাকরুহ বিধান রয়েছে, অন্য শ্রেণীর বিদ্বানগণ বলেন ইসলামে মাকরুহ বলে কোন বিধান নেই। আমার কাছে বিশুদ্ধমত হলো ইসলামে 'মাকরুহ' বলে কোন বিধান নেই। কারণ যারা 'মাকরুহ'কে ইসলামের একটি বিধান বলে উল্লেখ করেন, তারা বলেন 'মাকরুহ' হলো ইসলামের এমন একটি

বিধান যা সংঘটিত হলে নেকী ও গোনাহ্ নেই। অথচ ইসলামের মূলনীতি হলো কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত যাবতীয় কাজেই নেকী রয়েছে। যদি কোন বান্দা সেই নির্দেশ মোতাবেক নিজেকে পরিচালনা করে এবং কুরআন ও সুন্নাহয় নিষিদ্ধ যাবতীয় কাজেই গোনাহ্ রয়েছে যদি কোন বান্দা সেই নিষিদ্ধ না মেনে নিজের জীবন পরিচালনা করে। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হলো এমন সকল কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে তবে সেইটাও সেই বান্দার জন্য নেকীর কাজ।

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রসূল ﷺ কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর পথে জিহাদ করা। আমি বললাম, কোন গোলাম (কৃতদাস) স্বাধীন করা সর্বোত্তম? তিনি বললেন, যে তার মালিকের দৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও অধিক মূল্যবান। আমি বললাম, যদি আমি এসব (কাজ) করতে না পারি। তিনি বললেন, তুমি কোন কারিগরের সহযোগিতা করবে অথবা অকারিগরের কাজ করে দেবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ আপনি বলুন, যদি আমি (এর) কিছু কাজে অক্ষম হই (তাহলে কি করব?) তিনি বললেন, তুমি মানুষের উপর থেকে তোমার মন্দকে নিবৃত্ত কর। তাহলে তা হবে তোমার পক্ষ থেকে তোমার নিজের জন্য ছদকাহ স্বরূপ। (রিয়াদুছ ছলিহীন ১/১১৯; ছহিহ বুখারী হাঃ ২৫১৮; নাসায়ী, হাঃ ৩১২৯)

পাঠক বন্ধু! আমি যা স্পষ্ট করছি তা হলো একজন মানুষ তার সারা দিন ও সারা রাতে দুই প্রকার কাজ করে, একটি ভালো কাজ যাতে নেকী রয়েছে আর একটি মন্দ কাজ যাতে গোনাহ রয়েছে। এই দুই প্রকার কাজ বান্দার ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক, যে ভাবেই হোক সে করে ফেলবে। বান্দার সারা রাত ও সারা দিনই চলে এমন ভাবে। তবে এর মাঝখানে বান্দা আবার এমন কাজ করার সময়/সুযোগ কখন পেল যেই কাজটি করলে বান্দার নেকী ও গোনাহ্ নেই। এমন কাজ তো কোন মৃত মানুষের দ্বারাও হয় না, কারণ মৃত মানুষ ছদকায়ে জারিয়াহ পেয়ে থাকে। অতএব 'মাকরুহ' বলে ইসলামের এমন কোন বিধান নেই যা সংঘটিত হলে বান্দার নেকী ও গোনাহ্ কোনোটি হয় না। হ্যাঁ তবে 'মাকরুহ'

মানে যদি এমন কিছু বলা হয় যা সংঘটিত হলে বান্দার গোনাহ আছে আর সংঘটিত না হলে নেকী আছে। কারণ মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকাও ছদকাহ স্বরূপ। এ ক্ষেত্রে আর একটু পরিস্কার হওয়া জরুরী যে, 'মাকরুহ' কাজ সংঘটিত হলে কেন গোনাহ হবে? তার কারণ হলো- মাকরুহ অর্থ অপছন্দনীয়, ঘৃণিত, ঘৃণ্য, খারাপ। (আল মু'জামুল ওয়াফী, পৃঃ ৮২৩) এখন একটি বার চিন্তা করে দেখুন, যা অপছন্দনীয়, ঘৃণিত কাজ তা কখনই ভালো কাজ নয় আর এই 'মাকরুহ' দ্বারা শুধু মানুষের নিকট ঘৃণিত কাজ বুঝানো হয়েছে তা নয় বরং ইহা স্বয়ং মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট অপছন্দনীয়, ঘৃণিত কাজ। এটা ইসলামী বিধান হিসেবে নিলে হবে 'মাকরুহ' এমন একটি কাজ যা, আল্লাহর নিকট ঘৃণিত। যেমনঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

অর্থঃ "এগুলোর মধ্যে যে সমস্ত বিষয় খারাপ তোমার রবের নিকট তা ঘৃণিত।" (সূরাহ বানী ইসরাইল, আঃ ৩৮)

অতএব আল্লাহর নিকট যেই কাজটি অপছন্দনীয়, ঘৃণিত তা অবশ্যই অবশ্যই গোনাহের কাজ। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সেই কাজেরই আদেশ দিয়েছেন যা আল্লাহ পছন্দ করেন, আর এমন কাজ মুসলমানদের জন্য নিষেধ যা আল্লাহ অপছন্দ করেন, ঘৃণা করেন। কাজেই যারা 'মাকরুহ' মনে করে বিড়ি, সিগারেট, তামাকদ্রব্য সেবন করে এসেছেন নিঃসন্দেহে তারা গোনাহ করেছেন। সুতরাং এই হারাম ভক্ষণ গোনাহ থেকে এই মুহুর্তেই মহান আল্লাহর নিকট তওবা করে তা ভক্ষণ থেকে বিরত থাকুন।

✍ বিড়ি, সিগারেট, জর্দা, তামাকদ্রব্য কে হারাম জেনে, তা ভক্ষণ থেকে বিরত থাকার পরকালীন লাভঃ

পাঠক বন্ধু! অনেকেই হয়তো তর্কের খাতিরে এখনো বিড়ি, সিগারেট, জর্দা তামাকদ্রব্যকে জায়েজ বলতে পারেন। কিন্তু আপনি কি জানেন যদি সত্যি সত্যিই এই দ্রব্য গুলো হারাম হয় এবং আপনি জেনে বুঝে জেদের বশবর্তী হয়ে তা এখনও ভক্ষণ করে যান, হাশরের ময়দানে আপনি বিপদগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। যদি তওবা না করে মৃত্যু বরণ করেন। যদি তা হারাম না হয় অথচ আপনি সেই দ্রব্যগুলো ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকলেন এর জন্য আপনি বিচার দিবসে বিপদ গ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

এখন আপনিই বলেন তাক্বওয়ার দিক দিয়ে কোনটি উত্তম? বিড়ি, সিগারেট, জর্দা তামাক দ্রব্যকে জায়েজ জেনে ভক্ষণ করা? না কি সেই দ্রব্যগুলোকে হারাম জেনে তা ভক্ষণ থেকে বিরত থাকা?

প্রিয় মুসলিম ভাই, আপনার নিকট অনুরোধ রইলো, অন্তত তাক্বওয়ার দিকে লক্ষ্য করে আজই, এই মুহুর্ত থেকে সকল তামাকদ্রব্য বর্জন করুন। আপনার হাতে প্যাকেট থাকলে তা নষ্ট করে দিন এবং সকলকে সচেতন করুন। আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে হেফাজাত করুন 'আমীন'।

✍ নবী ﷺ এর যুগে থাকা শর্ত নয়ঃ

তামাক ও মাদকদ্রব্য সেবনকারীদের বিধান ও পরিনাম গ্রন্থের ১০-১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে 'অনেকে বলে থাকেন যে, বিড়ি, সিগারেট, জর্দা, ইয়াবা গুলসহ অন্যান্য তামাক দ্রব্যাদি নবী ﷺ এর যুগে ছিলনা। তাহলে কিভাবে তা হারাম হতে পারে? আমরা বলব, কোন বস্তু হারাম হওয়ার জন্য নবী ﷺ এর জীবিত থাকা শর্ত নয় বরং শরীয়াত নির্দেশিত শর্তগুলোই প্রযোজ্য। বিশ্ব নবী ﷺ এর যুগে অনেক বস্তুই ছিলনা, যা বর্তমান মানুষ ব্যবহার করছে। যেমনঃ এক হাদিসে প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন- শক্তি হল "রুমী"। তাই অনেকে এর অর্থ করেছেন তীর,

আর অধিকাংশ মনীষীগণ এর অর্থ করেছেন “নিক্ষিপ্ত”। অর্থাৎ যে যুগে আপডেট করে যে নিক্ষিপ্ত বস্ হবে, সেটিই হল রুমী। যেমন রসূল ﷺ এর যুগে ‘রুমী’ ছিল তার। বর্তমান যুগে ‘রুমী’ হল তীর, ক্ষেপনাস্ত্র, বোমাসহ অন্যান্য অস্ত্রসস্ত্র সমূহ। ঠিক তদরূপ বিশ্ব নবী ﷺ প্রত্যেক বস্তুর জন্য কিছু সূত্র রেখে গেছেন। সেগুলো যথা সময়ে, যথা স্থানে প্রয়োগ করে অর্থ বুঝে নিতে হবে। যেমনঃ রসূল ﷺ বলেছেন- যাবতীয় নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই মদ আর যাবতীয় মদই হারাম। তিনি আরো বলেছেন- যে বস্তু বেশি খেলে বা পান করলে নেশা আসে, তার অল্পও হারাম। এছাড়াও আরো হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবুল জুওয়াইরিয়া (রাঃ) বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ) কে ‘বাজাক’ সম্পর্কে প্রশ্ন করে ছিলাম, তিনি উত্তরে বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ ‘বাজাক’ আবিস্কারের পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেছেন। অতএব যে বস্তু নেশা সৃষ্টি করে তাই হারাম। (ছহিহ বুখারী, হাঃ ৫৫৮৯) উক্ত আলোচনা প্রমাণ করে যে, তামাক, জর্দা, বিড়ি, সিগারেট, গুল, ইয়াবাসহ অন্যান্য সকল নেশাদ্রব্য অবশ্যই হারাম।

✍ সকল প্রকার হালাল ও পবিত্র খাদ্য এবং পানি পানাহারের কিছু নিয়মঃ

পাঠক বন্ধু! ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। একজন মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সুন্দর ভাবে পরিচালনা করার শিক্ষাও দিয়েছে ইসলাম। যার কিছু নিয়ম ধারাবাহিক ভাবে নিম্নে উল্লেখ করলামঃ

✍ পানাহারের শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ এবং শেষে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলাঃ

হযরত উমার ইবনে আবু সালামাহ (রাঃ) বলেন, (একদা খাবার সময়) আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বললেন, শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বল, ডান হাত দ্বারা আহার কর এবং তোমার নিকট (তথা সামনে) থেকে খাও। (রিয়াদুছ ছলিহীন ১/৭৩২; ছহিহ বুখারী হাঃ ৫৩৭৬)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন তোমাদের কেউ যখন আহার করবে, সে যেন শুরুতে আল্লাহ তা'য়ালার নাম নেয়। যদি শুরুতে আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায়, তাহলে যেন বলে 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরহু।' (রিয়াদুছ ছলিহীন ২/৭৩৩; আবু দাউদ হাঃ ৩৭৬৭; তিরমিযী হাঃ ১৮৫৮) হযরত মুয়ায ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আহার শেষে এই দু'আ পড়বে 'আল-হামদু-লিল্লা-হিল্লাজি-আত্ব আ'মানী হাজা, ওয়া রযাকনীহি মিন গইরি হাওলিম মিন্নী ওয়া লা কুউ ওয়াহ।' (অর্থ- সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে এ খাওয়ালেন এবং জীবিকা দান করলেন আমার কোন চেষ্টা ও সামর্থ ছাড়াই।) সে ব্যক্তির পূর্বের সমস্ত (ছোট) পাপ মোচন করে দেওয়া হবে। (রিয়াদুছ ছলিহীন ৮/৭৩৯; আবু দাউদ হাঃ ৪২০৩; দারেমী হাঃ ২৬৯০) হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, নবী ﷺ যখন দস্তর খানা গুটাইতেন তখন এই দুয়া পড়তেন, 'আল হামদু লিল্লাহি হামদাং কাসীরং ত্বই-ই-বান মুবা-র-কাং ফীহ গাইরো মাকফিই ঈন, ওয়ালা মুওয়াদ্দাই'ন ওয়ালা মুছতাগনা ইয়ান আ'নহু রব্বানা। (অর্থ-আল্লাহর জন্য অগণিত পবিত্র ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা। অকুণ্ঠ, নিরবিচ্ছিন্ন, প্রয়োজন সাপেক্ষ প্রশংসা, হে আমাদের প্রতিপালক।) (রিয়াদুছ ছালিহীন ৭/৭৩৮; ছহিহ বুখারী হাঃ ৫৪৫৮)

✍ পানাহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ না বলার যেই ক্ষতিঃ

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি যখন নিজ বাড়ি প্রবেশের সময় ও আহারের সময় আল্লাহ তায়ালাকে স্বরণ করে অর্থাৎ (বিসমিল্লাহ বলে) তখন শয়তান তার সহচরদেরকে বলে, আজ না তোমরা এ ঘরে রাত্রি যাপন করতে পারবে, আর না খাবার পাবে। অন্যথায় যখন সে প্রবেশের সময় আল্লাহ তায়ালাকে স্বরণ করে না (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলে না), তখন শয়তান বলে, তোমরা রাত্রি যাপন করার স্থান পেলে, আর যখন আহার কালেও আল্লাহ তায়ালাকে স্বরণ করে না অর্থাৎ (বিসমিল্লাহ বলে না, তখন সে

তার সহচরদেরকে বলে, তোমরা রাত্রিযাপন স্থল ও রাতের খাবার উভয়ই পেয়ে গেল। (রিয়াদুছ ছলিহীন ৩/৭৩৪; মুসলিম হাঃ ২০১৮)

✍ কোনো খাবারের দোষত্রুটি বর্ণনা না করা এবং তার প্রশংসা করা উত্তমঃ

পাঠক বন্ধুঃ অধিকাংশ মানুষই খাবারের দোষ ধরা রোগে আক্রান্ত। অথচ যে রাধুনী কষ্ট করে রান্না করে খাওয়ার জন্য খাদ্যকে সামনে এনে দিয়েছে সে অবশ্যই প্রাণপণে চেষ্টা করেছে তার রান্নাটি যেন ভালো হয়। কখনোই কোনো রাধুনী চায়না তার রান্নাটি মন্দ হোক। যে রান্না করে সে তার সর্বাত্মক শ্রম দিয়েই রান্নাকে সুস্বাদু করার চেষ্টা করে আর রান্নাটি যে কতো কষ্টের কাজ, আমি বিশেষ করে মা-বোনদের কথা বলছি, তারা সারাটি দিন স্বামীর সংসারে শ্রম দেয় স্বামীর সংসার দেখা, স্বামীর সন্তানদের যত্ন নেয়া, বাড়ির গরু-ছাগলের দিকে খেয়াল রাখা, ইত্যাদি কতো কি! এরই মধ্যে আবার দিনে তিন বার রান্না করা, আহ! কত কষ্টের কাজ। এতো কষ্ট করেও কি অজ্ঞ স্বামীদের মন পাওয়া যায়, ঐ ভাতে বা তরকারিতে একটু চুল পাওয়া গেলেই ঐ অকৃতজ্ঞ মূর্খ স্বামীটি ভাতের থালা জমিনে ছিটকে ফেলে দেয়। একটি বারও বুঝার চেষ্টা করে না, সেই স্ত্রীটি ইচ্ছে করে খাবারে চুল দেয়নি।

আহা-রে মুসলিম ভাই, যদি তোমার খাবার থালাতে চুল পেয়ে খাবার রুচি হারিয়ে যায়। আর সে জন্য তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে দাও, তবে আমি বলছি এটা তোমার একটি রোগ, সেই রোগের নাম অকৃতজ্ঞ রোগ। এই রোগটি অনেক ভয়াবহ একটি রোগ, যদি তুমি সেই রোগ থেকে মুক্তি পেতে চাও- তাহলে আমি তোমাকে একটি চিকিৎসা দিচ্ছি সেই চিকিৎসাটি তুমি গ্রহণ কর। তোমার রোগ সেরে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর সেই চিকিৎসা হলোঃ

১. তুমি বড় বড় চুল রেখে দাও। অর্থাৎ তুমি তোমার চুল বাবরি রাখ।

২. তুমি এমন জায়গাতে কিছু দিন চলাচল কর, যেখানে সকলেরই ছোট চুল আর তোমার চুল বড় বড়।

৩. কুরআন অর্থসহ তেলওয়াতে অধিক মনোযোগী হও।

পাঠক বন্ধু! ঐ সকল স্বামীরা যে শুধু চুল পেয়েই স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয় তা নয়; বরং এমনও অকৃতজ্ঞ মূর্খ স্বামী রয়েছে তারা তরকারীতে একটু স্বাদ না পেলেই অসহায় স্ত্রীটির সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয়। অথচ তারা নিজেদেরকে বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উম্মাত বলেও দাবি করে। অথচ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ কখনো কোন খাবারের দোষ ধরেননি। ভালো লাগলে তিনি তা খেয়েছেন এবং খারাপ লাগলে তিনি তা ত্যাগ করেছেন। (রিয়াদুছ ছলিহীন ১/৭৪০; ছহিহ বুখারী হাঃ ৪৫০৯)

জানা প্রয়োজনঃ

অমুসলিমদের পাত্রে (তাদের দোকান ও হোটেলে) খাওয়া নিষেধ, তবে তাদের পাত্র (দোকান ও হোটেল) ছাড়া যদি মুসলিমদের কোন পাত্র (দোকান বা হোটেল) না পাওয়া যায়, তাহলে নিরূপায় অবস্থায় তাদের সেই পাত্রে (ধোয়ার পর তাদের দোকান বা হোটেলে) খাওয়ার অনুমতি রয়েছে। (ইসলামী জীবনধারা, পৃঃ ১২)

✍ নিমন্ত্রিত ব্যক্তির কেউ সাথী হলে সে নিমন্ত্রনদাতাকে যা বলবেঃ

হযরত আবু মাসউদ বদরী (রাঃ) বলেন, ... একটি দাওয়াত দিল, যা সে পাঁচজনের জন্য প্রস্তুত করেছিল, যার পঞ্চম ব্যক্তি ছিলেন তিনি। (রাস্তায়) এক (অনাহুত) ব্যক্তি তাদের অনুগামী হল। যখন তাঁরা বাড়ির দরজায় পৌছলেন, তখন নবী ﷺ (আমন্ত্রনকারীকে) বললেন, ‘এ ব্যক্তি আমাদের সাথে চলে এসেছে তুমি চাইলে ওকে অনুমতি দিতে পার, না চাইলে ও ফিরে যাবে।’ কিন্তু সে বলল,

'হে আল্লাহর রসূল ﷺ বরং আমি তাকে অনুমতি দিলাম।' (রিয়াদুছ ছলিহীন ২/৭৪৩; ছহিহ বুখারী হাঃ ২০৮১)

✍ একপাত্রে দলবদ্ধ ভাবে খাবার সময় সাথীদের অনুমতি ব্যতীত খেজুর বা অনুরূপ কোন ফল জোড়া জোড়া খাওয়া নিষেধঃ

হযরত জাবালাহ ইবনে সুহাইম বলেন, ইবনে যুবাইরের খেলাফতকালে আমরা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়ে ছিলাম। সুতরাং আমাদেরকে খেজুর দেওয়া হত। আর আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন, যখন আমরা আহার করতাম। তিনি বলতেন, তোমরা জোড়া জোড়া খেজুর এক সাথে খাবে না । কেননা, নবী ﷺ জোড়া খেজুর (দুটো খেজুর এক সঙ্গে) খেতে বারন করেছেন। তারপর বললেন, তবে যদি তার সঙ্গী ভাইয়ের কাছে সে অনুমতি গ্রহণ করে (তবে তা ভিন্ন ব্যাপার)। (রিয়াদুছ ছলিহিন ১/৭৪৬; ছহিহ বুখারী হাঃ ২৪৫৫)

✍ খাবার পাত্রের একধার থেকে খাবার খেতে হবে, মাঝখান থেকে খাওয়া যাবে নাঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'যেহেতু খাবারের মাঝখানে বরকত নাযিল হয়, সেহেতু তোমরা এর দুই ধার থেকে খাও, আর এর মাঝখান থেকে খেয়োনা।' (রিয়াদুছ ছলিহীন ১/৭৪৮; তিরমিযী হাঃ ১৮০৫)

✍ পানি পান করার আদবঃ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ পানি পান করার সময় তিনবার দম নিতেন অর্থাৎ তিনি পান পাত্রের বাইরে তিনবার নিঃশ্বাস ফেলতেন। (ছহিহ বুখারী হাঃ ৫৬৩১)

জানা প্রয়োজনঃ

পাঠক বন্ধু! আমি খুবই সংক্ষিপ্ত ভাবে 'ইসলাম পালনের মূলনীতি',

ক) "নিজেকে বাঁচানো" শিরোনামের আলোচনা করার চেষ্টা করেছি, আর এই আলোচনাগুলোতে আমি ইসলামের মৌলিক ৫টি বিষয়ের আলোচনা না এনে, সেই আলোচনাগুলোই সংক্ষেপে করার চেষ্ট করেছি- ইসলামের যেই নিয়ম-নীতি গুলোতে মানুষ খুবই কম গুরুত্ব দেয়। আর এই অবহেলিত নিয়ম-নীতির মধ্যে আর একটি আমলের তাকীদ আমি মুসলিম ভাই ও বোনদেরকে দিচ্ছি তা হলো- অনাহারীকে খাদ্য দান ও পরিচিত-অপরিচিত সকলকেই সালাম প্রদান।

পাঠক বন্ধু! এই আমলটি যদিও অনেক ক্ষুদ্র মনে হয়, কিন্তু আসলে তা ক্ষুদ্র নয়, বরং এটাই হলো ইসলামের বাহ্যিক শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যম। আর এই আমলটির যথেষ্ট্য মর্যাদাও রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করল, সর্বোত্তম ইসলামী কাজ কী? তিনি বললেন, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করবে এবং পরিচিত ও অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম প্রদান করবে। (ছহিহ বুখারী হাঃ ১২, ২৮, ৬২৩৬)

খ) পরিবার-পরিজনকে বাঁচানোঃ

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শাফী (রহিঃ) বলেন, সূরা তাহরিম এর ৬ নং আয়াতের (আহ্‌লিকুম) শব্দের মধ্যে পরিবার-পরিজন তথা স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, চাকর-নওকর সবই দাখিল আছে। এক বর্ণনায় আছে এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত উমার (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ, নিজেদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারটি তো বুঝে আসে (যে আমরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকব এবং আল্লাহর দেয়া বিধি বিধান পালন করব) কিন্তু পরিবার-পরিজনকে আমরা কিভাবে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবো? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, এর উপায় এই যে, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে যে সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তোমরা তাদেরকে সে সব কাজ করতে নিষেধ কর এবং যে সকল

কাজ করতে আদেশ করেছেন, তোমরা পরিবার-পরিজনকেও সেগুলো করতে আদেশ কর। এই কর্মপন্থা তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করতে পারবে। (রুহুল মা'আনী)

✍ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্যঃ

বিদ্বানগণ বলেন, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে ফরজ কর্মসমূহ এবং হালাল ও হারামের বিধানাবলী শিক্ষা দেয়া এবং তা পালন করানোর চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরজ। একথা আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে। এক হাদিছে আছে আল্লাহ তা'য়ালা সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে বলে হে আমার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি, তোমাদের ছলাত, তোমাদের ছিয়াম, তোমাদের যাকাত, তোমাদের ইয়াতিম, তোমাদের মিসকীন, তোমাদের প্রতিবেশী, আশা করা যায় আল্লাহ তা'য়ালা সবাইকে তোমাদের সাথে জান্নাতে সমবেত করবেন। এখানে তোমাদের ছলাত, তোমাদের ছিয়াম, ইত্যাদি বলার উদ্দেশ্য এই যে, এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখো, এতে গাফেল হওয়া উচিত নয়। তোমাদের ইয়াতিম, তোমাদের মিসকীন বলার উদ্দেশ্য এই যে, তাদের প্রাপ্য খুশি মনে আদায় কর। জনৈক বিদ্বান বলেন, সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সর্বাধিক আযাবে থাকবে, যার পরিবার-পরিজন ধর্ম সম্পর্কে মূর্খ ও উদাসীন হবে। (রুহুল মা'আনী; তাফসিরে মা'রিফুল কুরআন, পৃঃ ১৩৮৭-১৩৮৮)

অতএব প্রত্যেক পিতা-মাতার জন্য অতীব জরুরি বিষয় হলো তাঁর সন্তান-সন্ততিকে ইসলামী শিক্ষা দিক্ষা প্রদান করা।

✍ বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমান ইসলামী শিক্ষা বলতে যা বোঝেঃ

পাঠক বন্ধ! বর্তমানে এক শ্রেনীর মুসলমান ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে বোঝে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে মক্তব/মাদরাসায় কুরআন শিক্ষা দেয়া, বড় জোর কিছু লোককে দেখা যায় যাদের ছেলে মেয়ে বড় হয়ে গেছে তবুও ছেলে-মেয়েদেরকে কুরআন শিক্ষক ডেকে এনে বাড়িতে কুরআন শিক্ষা দেয়।

আল-হামদুলিল্লাহ পিতা-মাতার এই প্রচেষ্টাটুকু কেও তুচ্ছ্য ভাবা যাবেনা। কারণ, তারা তাদের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করে থাকেন সন্তান-সন্তাদিকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার। আমি দেখেছি, রাজশাহী মহানগরীর মধ্যে একজন কর্মজীবীকে, যার বাড়ি গোপালগঞ্জ জেলায়, রাজশাহীতে চাকুরীর সুবাদে থাকেন। তার তিনটা ছেলে। তিনটাই বড় হয়ে গেছে এবং তাদের কেউ কলেজ, কেউ ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। চাচাটির নাম হলো জমশেদ, সে বৃদ্ধ বয়সে কুরআন শিক্ষার জন্য আমার কাছে আবেদন করলেন যে, হুজুর আমি এবং আমার তিন সন্তান আপনার কাছে কুরআন শিক্ষা করবো, আমি সম্মতি দিলাম। কুরআন শিখানো শুরু করলাম। নিয়মিত ক্লাস চলে তার সন্তানরাও ক্লাসে বসে, এভাবে সপ্তাহ খানেক যেতেই সন্তানরা একে একে ক্লাস থেকে হারিয়ে গেল। জমশেদ চাচা বৃদ্ধ মানুষ শত চেষ্টা করেও আর সন্তানদেরকে ক্লাসে বসাতে পারে না। ক্লাসের সময় হয় আর তার আগ মুহুর্তেই সন্তানগুলো বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। আমিও অনেক বার চেষ্টা করেছি তাদের সাথে সাক্ষাত করে কথা বলার। কিন্তু তারা আর কোন ভাবেই আমার সাথে সাক্ষাত দেয়নি।

অতএব জমশেদ চাচার চেষ্টা ছিলো, কিন্তু সন্তানদের অবহেলায় তা হয়ে উঠেনি। কাজেই সন্তানরা ছোট থাকতেই তাদেরকে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া শুরু করতে হবে। আর দ্বীনি শিক্ষা মানে শুধু এই নয় যে, তাকে শুধু কুরআন শিক্ষা দিয়েই ছেড়ে দিতে হবে বরং ইসলামের প্রতিটি বিধি-বিধানই বাস্তবভাবে শিক্ষা দিতে হবে,

আর এটাও মনে রাখতে হবে যে শুধু হাফেজ, মাওলানা, মুফতি, মুহাদ্দিস বানালেই সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া হয়না। কেননা অনেক হাফেজ, মাওলানা, মুফতি সাহেব আছে যারা সার্টিফিকেট অর্জন করলেও সমাজে ইসলামের বাস্তব শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে জানে না। কারণ ইসলামের সেই বাস্তব শিক্ষাটি তার মাঝে নেই। সুতরাং সন্তানদেরকে ইসলামের বাস্তব শিক্ষা প্রদান করতে হবে, আর সন্তানকে ইসলামের বাস্তব শিক্ষা দিয়ে শিক্ষিত করতে হলে পিতা/মাতাকেই অধিক ভূমিকা পালন করতে হবে।

✍ সন্তানকে যেভাবে ইসলামের বাস্তব শিক্ষা দিবেনঃ

পাঠক বন্ধু! আপনার সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, সকলকেই দ্বীনি শিক্ষা দিতে হবে, এটা আপনার জন্য অবশ্যই কর্তব্য। আর সেই দ্বীনি শিক্ষাটি হতে হবে ইসলামের প্রত্যেক বিধি-বিধান সম্পর্কেই বাস্তব শিক্ষা। এর জন্য অবশ্যই পিতা-মাতাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। বর্তমান সময়ে তিন শ্রেনীর পিতা-মাতাকে পাওয়া যায়-

ক) অশিক্ষিত যারা-বাংলা, আরবী কিছুই পড়া বা লিখতে জানে না।

খ) সাধারন শিক্ষিত-অর্থাৎ যারা বাংলা, ইংরেজি লিখতে ও পড়তে জানে, কিন্তু আরবী লিখতে ও পড়তে জানে না অথবা কুরআন দেখে পড়তে পারে।

গ) মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত।

আমি নিম্নে সাধারনত প্রথম শ্রেনীর উদাহরণই উল্লেখ করবো, কিভাবে তারা তাদের সন্তানকে ইসলামের বাস্তব শিক্ষা দিবেন।

১. আপনার সন্তানকে যেভাবে কুরআন শিক্ষা দিবেন। যেমন- আপনি একজন সাধারন কৃষক বা দিন মজুর। আপনি আরবী বা বাংলা লেখা পড়া কিছুই

জানেন না। আলেমদের ওয়াজ-নসিহা শুনে জুমআর খুৎবা শুনে ইসলাম সম্পর্কে কিছু ধারনা এসেছে? আপনার সন্তানকে মাদরাসা বা মক্তবে ভর্তি করে দিন। যখন সময় পান সন্তানের কাছে বসুন। সারা দিনে না পারেন অন্তত প্রত্যেক রাতেই একবার বসুন। সন্তানকে নরম ভাষায় বলুন বাবা, তুমিতো কুরআন শিখছো, আমিতো একটু আশা করছি তোমার মিষ্টি মুখ থেকে কুরআন শোনার অথবা আরবী কায়দা বা সেপারা শোনার। আমাকে শোনাও বাছা। যখন আপনার সন্তান আপনাকে পড়া শোনাবে তখন আপনি আপনার সন্তানকে আদর করে কপালে/গালে দু/একটি চুমু দিয়ে দিন। দেখবেন আপনার সন্তান আনন্দ পাবে এবং পড়া লেখাতেও তার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

২. অত:পর যখন দেখবেন আপনার সন্তান বাংলা বা আরবী অথবা দুটোই দেখে ভালো ভাবে পড়তে পারছে। তখন আপনার আরেকটি ভূমিকা রয়েছে তা হলো- কোন হুজুরের নিকট গিয়ে আরবীতে অথবা বাংলাতে অর্থ সহ দু'টি দু'আ বড় করে লিখে নিবেন। সেই দু'আ দুটি হলো-

ক) পায়খানায় প্রবেশের দু'আ।

খ) পায়খানা থেকে বের হবার দু'আ।

এবার দু'আ দুটি কম্পিউটারের দোকানে গিয়ে বড় বড় করে লিখে ল্যামেনেটিং করে নিন। অত:পর লেখা দুটো এনে টয়লেটের বাহিরে এমন একটি স্থানে ঝুলিয়ে রাখবেন যেন পায়খানায় প্রবেশের পূর্বেই আপনার সন্তান বা পরিবারের সকলেরই চোখে পড়ে। সন্তানকে শিখিয়ে দিবেন তারা যেন পায়খানায় প্রবেশের সময় এবং বের হবার সময় নিয়ম মেনে দু'আ পড়ে বের হয় এবং আপনি আপনার সন্তানকে দু'আগুলো কয়েক বার স্বশব্দে পড়তে বলবেন। যেন সেই পড়া শুনে আপনি দু'আ দুটি মুখস্থ করে নিতে পারেন। এভাবে অল্প কয়েক দিন কষ্ট করলেই দেখবেন আপনার সন্তান সেই আমলটি বাস্তব ভাবে শিক্ষা পেয়ে গেছে।

৩. অনুরূপ ভাবে, যখন বাড়িতে খাবার খাবেন, তখন চেষ্টা করবেন একা একা না খেতে বসে স্ত্রী-সন্তান এবং যদি বৃদ্ধ পিতা-মাতা থাকে তাদেরকে সাথে নিয়েই খেতে বসবেন। খাবার কয়েক দিন আপনিই কষ্ট করে সকলের থালাতে উঠিয়ে দিবেন এবং খাবারের মুল পাত্রে বা গামলা থেকে খাবার উঠানোর জন্য চামচ বা হাত গামলায় রাখার সময় একটু জোরে শব্দ করে "বিসমিল্লাহ" বলবেন। গামলার একপাশ থেকে খাবার উঠাবেন। এমন ভাবে কয়েক দিন করলেই দেখবেন আপনার স্ত্রী, সন্তান শিখে গেছে খাবার উঠানোর সময়, গামলার হাত প্রবেশের সময় "বিসমিল্লাহ" বলতে হয়, এবং গামলার একপাশ থেকে খাবার উঠাতে হয়।

ডান থেকে শুরু করে আপনি নিজেই সকলের থালায় খাবার উঠিয়ে দিন এবং খাবার শুরু করার সময় আপনি একটু জোরে "বিসমিল্লাহ" বলুন। খাওয়ার শেষে অনুরূপ ভাবে আল-হামদুলিল্লাহ বলুন এমনভাবেই কিছু দিন। দেখবেন আপনার স্ত্রী-সন্তান সেই আমলটি বাস্তব ভাবে শিক্ষা পেয়ে গেছে।

৪. অত:পর যখন দেখছেন আপনার সন্তান উপরোক্ত আমলগুলো করছে এবং তাতে আগ্রহী, তখন আপনি আপনার সন্তানকে ইসলামী লেবাস পরিধানে অভ্যস্ত করে তুলেন। সন্তানদেরকে ইসলামের বাস্তব শিক্ষা প্রদানের জন্য পিতা-মাতার প্রধান কাজই হলো সন্তানদেরকে ইসলামী লেবাস পরিধানে অভ্যস্ত করা। যখন ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ইসলামী লেবাস পরিধানে অভ্যস্ত হবে তখন তারা ইসলামের অন্যান্য শিক্ষা গ্রহণ ও পালনেও আগ্রহী হবে। আমি ইতিপূর্বে ছেলেদের লেবাস সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন ইসলামে মহিলাদের লেবাস কেমন হওয়া উচিৎ সে সম্পর্কে উল্লেখ করছি।

✍ ইসলামে মহিলাদের লেবাসঃ

১. লেবাস যেন দেহের সকল অঙ্গকে ঢেকে রাখে। দেহের কোন অঙ্গ বা সৌন্দর্য যেন কোন বেগানা পুরুষের সামনে প্রকাশ না পায়। কেননা প্রিয় নাবী ﷺ বলেছেন, মহিলাদের সবটাই লজ্জাস্থান (গোপনীয়)। আর সে যখন বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে পরিশোভিতা করে তোলে। (তিরমিযী; মিশকাত হাঃ ৩১০৯)

২. আর মহিলার পরিধিত লেবাস যেন এমন পাতলা না হয়, যাতে কাপড়ের উপর থেকেও ভিতরের চামড়া নজরে আসে, তাতে শরীর ঢাকা থাকলেও তা খোলার পর্যায়ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে এক হাদিসে আল্লাহর রসূল ﷺ আসমা (রাঃ) কে সর্তক করেছিলেন। (আবু দাউদ; মিশকাত হাঃ ৪৩৭২) একদা হাফসা বিনতে আব্দুর রহমান পাতলা ওড়না পড়ে আয়েশা (রাঃ) এর নিকট গেলে তিনি তার ওড়নাকে ছিড়ে ফেলে তাকে একটি মোটা ওড়না পরতে দিলেন। (মুয়াত্তা মালেক; মিশকাত হাঃ ৪৩৭৫)

রসূল ﷺ বলেন, দুই শ্রেনীর মানুষ জাহান্নামবাসী, যাদেরকে আমি (এখনো) দেখিনি। এদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ সেই মহিলা দল, যারা কাপড় পড়েও উলঙ্গ থাকবে। অপর পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেও তার দিকে আকৃষ্ট হবে। (ছহিহুল জামে হাঃ ৩৭৯৯)

৩. লেবাস যেন আটো-সাটো (টাইট ফিট) না হয়, যাতে দেহের উঁচু-নিচু প্রকাশ পায়। কারণ এমন টাও খোলার পর্যায়ভুক্ত এবং দৃষ্টি আকর্ষী।

৪. যেন সুগন্ধি না হয়।

প্রিয় নাবী ﷺ বলেছেন, সেন্ট বা সুগন্ধি বিলাবার উদ্দেশ্যে কোন মহিলা যদি তা ব্যবহার করে পুরুষদের সামনে যায়, তবে সে যেনাকারী মহিলা। (আবু দাউদ; তিরমিযী; মিশকাত হাঃ ১০৬৫) সেন্ট বা সুগন্ধি ব্যবহার করে মহিলা মসজিদেও

যেতে পারবে না। একদা চাশতের সময় আবূ হুরায়রা (রাঃ) মসজিদ থেকে বের হলেন। দেখলেন, একটি মহিলা মসজিদে প্রবেশে উদ্যত। তার দেহ বা লেবাস থেকে উৎকৃষ্ট সুগন্ধির সুবাস ছড়াচ্ছিল। আবূ হুরায়রা (রাঃ) মহিলাটির উদ্দেশ্যে বললেন, 'আলাইকিছ ছালাম'। মহিলাটি সালামের উত্তর দিল। তিনি তাকে প্রশ্ন কররেন, কোথায় যাবে তুমি? সে বলল, মসজিদে। বললেন- কি জন্য এমন সুগন্ধি মেখেছ তুমি? বলল, মসজিদের জন্য। বললেন- আল্লাহর কসম? বলল, আল্লাহর কসম। পুনরায় বললেন- আল্লাহর কসম? বলল- আল্লাহর কসম? তখন তিনি বললেন, তবে শোন, আমাকে আমার প্রিয়তম আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন যে, সেই মহিলার কোন ছলাত কবুল হয় না, যে তার স্বামী ব্যতীত অন্য কারোর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে; যতক্ষণ সে সহবাসের গোসলের ন্যায় গোসল না করে নেয়। অতএব তুমি ফিরে যাও। গোসল করে সুগন্ধি ধুয়ে ফেল। তারপর ফিরে এসে ছলাত পড়ো। (আবু দাউদ; সিলসিলাহ সহীহাহ; মিশকাত হা: ১০৩১)

জানা প্রয়োজনঃ

যে সকল বোরকা সৌন্দর্য খচিত, সে বোরকাকেও আরেকটি সৌন্দর্যহীন বোরকা দিয়ে ঢাকা জরুরী।

পাঠক বন্ধু! বর্তমানে কিছু বোরকা দেখা যায়, যেগুলো টাইট-ফিট, আর কিছু বোরকা দেখা যায় বোরকাগুলোর সামনের উপরের অংশ কাটার মতো ইত্যাদি। এই জাতীয় বোরকা পরিধান করে মহিলাদের বাইরে বের হওয়া যাবে না। বরং ঐ জাতীয় বোরকার উপর ইসলামে অনুমদিত বোরকা পরিধান করতে হবে। নচেৎ ঐ জাতীয় বোরকাকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে। কাজেই আপনার কন্যা সন্তানকে ছোট থাকতেই আপনি সেই বোরকা পরিধানে অভ্যস্ত করে তুলুন, যেই বোরকা পরিধানের জন্য ইসলাম আদেশ দিয়েছে।

৫. অতঃপর আপনার ছেলে-মেয়ে যখন ইসলামী লেবাস পরিধানে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে ইসলামের অন্যান্য আমলগুলো বাস্তবে শিক্ষা দিন।

প্রিয় পাঠক! আর একটি বিষয় আপনি অবশ্যই মনে রাখবেন তা হলো- এইগুলোর পাশাপাশি আপনাকেও কুরআন মাজিদ শিক্ষা করতে হবে। কেননা, কুরআন মাজিদ শিক্ষা করা আপনার জন্য ফরয।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۝١

অর্থ: "পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরাহ আলাক, আঃ ০১)

অত্র আয়াতের মাধ্যমে আরো একটি শিক্ষা আপনার জন্য ওয়াজিব হয়েছে তা হলো আপনার মাতৃভাষা। কেননা আপনি যদি আপনার মাতৃভাষা অন্তত দেখে ভালোভাবে না পড়তে পারেন তা হলে আপনার প্রতিপালকের আরো বিধান বা আদেশ নিষেধ রয়েছে যা আপনি সঠিক ভাবে যাচাই-বাছাই করতে পারবেন না। কাজেই আপনাকে আপনার মাতৃভাষাও শিখতে হবে যেন অন্তত আপনি আপনার মাতৃভাষা দেখে সুন্দর ভাবে বুঝে পড়তে পারেন।

আর যেই সকল পিতা-মাতা লেখাপড়া জানে, সন্তানদেরকে ইসলামের বাস্তব শিক্ষা প্রদানের উপরে উল্লেখিত পদ্ধতিগুলোর পাশাপাশি আরো একটি পদ্ধতিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিবেন। আর তা হলো- সারাদিন ও রাতে অন্তত ১৫ মিনিট করে দুইটি সময় নিদিষ্ট করে নিবেন। যেই সময়ে আপনি আপনার ছেলে-মেয়ে অর্থাৎ পরিবারের সকলকে নিয়ে গোল হয়ে বসে ১ বার কুরআনের অন্তত ৫টি আয়াত অর্থসহ পড়বেন এবং আরো একবার কোন একটা নির্বাচিত হাদিস গ্রন্থ থেকে

৫টি করে হাদিস পাঠ করবেন। এই আমলটি আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে নিয়মিত করে যান। ‘ইনশাআল্লাহ’ উত্তম ফল পাবেন।

মহান আল্লাহ তা’য়ালা আমাদের সকলকেই ইসলাম পালনের উপরোক্ত দুটি মূলনীতি মেনে চলার তাওফিক দান করুন 'আমীন'।

পাঠক বন্ধু! ইসলাম পালনের মূলনীতি দুটি আপনি নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করুন এবং তা আপনার পাশেরই আরেক ভাই এর নিকট পৌছে দিন। কেননা মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, কথায় কে উত্তম ঐ ব্যাক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহব্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে আমি তো অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরাহ হা-মীম আস সাজদা, আ: ৩৩)

সমাপ্ত

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ এর লিখিত বইসমূহঃ

১। সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ

২। আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে

৩। মাসজিদে যিরার (লিখিত বক্তব্য)

৪। ইসলামের বুনিয়াদ শিক্ষা

৫। ইসলাম পালনের মূলনীতি

৬। মুক্তির পয়গাম

৭। ইসলামে সামাজিক জীবন

৮। তোমার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত

৯। দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদের ভূমিকা

১০। ইসলামে মৃত ব্যক্তিদের সম্পদ বণ্টন নীতি

১১। তাওহীদ আল ইবাদাহ

১২। আল্লাহর পথের পথিক

১৩। তা'লিমুত তাওহীদ